হিরো আমার

হিরো আমার

শেফালী দাস

হিরো আমার
শেফালী দাস
প্রকাশকাল: মে-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : মো. লুৎফর রহমান
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৩০০/-(তিনশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৯৯৯৪-০-৯
ISBN: 978-984-99994-0-9
Hero Amar by Shefali Das, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: May-2025, Copy Right: Md. Lutfar Rahman, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 300/- (Three Hundred Taka Only).
ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন−http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ

'আমার মাতৃসম সেজদি মুকুল রানী ধর
ও
মেজদি কমল রানী দাসকে
গভীর শ্রদ্ধার সাথে বইটি উৎসর্গ করলাম।'

তাড়াহুড়ো করে প্রিন্সিপাল ম্যাডামের রুমে ঢুকতে ঢুকতে কার সঙ্গে যেন ধাক্কা খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলাম। পড়তে পড়তে কেমন করে যেন উঠে দাঁড়ালাম। ম্যাডাম রেগে একটু জোরেই বলল, দেখতে পাওনি? আমি যেন লজ্জায় কেমন আড়ষ্ট হয়ে গৃহের এককোণে দাঁড়ালাম। পর্দার ওপাশ থেকে সুদর্শন এক যুবক এগিয়ে এসে বলল, না না কিছুই হয়নি। তাছাড়া আমিও তো দেখতে পাইনি, দোষ আমারও তো কম নয়। এ কথা বলে যুবক কেমন যেন অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, দু'হাত জোর করে বললাম- মাফ করবেন, সত্যিই আমি দেখতে পাইনি, তাছাড়া ক্লাসের ঘণ্টা বেজে গেছে এবং একই সঙ্গে ম্যাডামও ডেকেছেন, প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা শেষ করে বের হয়ে এসে দেখি যুবকটি প্রিন্সিপালের কক্ষের পাশে করিডোরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হলো নিচুস্বরে কে যেন ডাকলো আমায়। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সুন্দর পরিপাটি পোশাকে সুপুরুষটি দাঁড়িয়ে আছে, আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, ম্যাডাম কিছু মনে করেননি তো? আপনার লাগেনি তো কোথাও?

বললাম, না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

– ব্যস্ত হবো না মানে?

– ব্যস্ত হবেন না মানে ব্যস্ত হবেন না। আমার কিছু হয়নি।

– বেশ, কিছু না হওয়াই ভালো। আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার খুব ইচ্ছে ছিলো।

– ইচ্ছে থাকলেই তো আর সব ইচ্ছে পূরণ হয় না। এখন আমার একটা ক্লাস আছে। এমনিতেই ক্লাসে যেতে দেরী হয়ে গেলো। সময় করে একদিন আসুন, তখন আলাপ হবে।

যুবকটি আচ্ছা বলে চলে গেলো।

আমি ক্লাস শেষ করে কমনরুমে বসে বসে লোকটির কথাই ভাবছিলাম, চেনা নেই, জানা নেই, কথা বলার এত আগ্রহ কেন? তাছাড়া যুবকটি সম্বন্ধে আমারও তো তেমন কিছু জানা নেই, লোকটি কে, কোথায় বাড়ি? নামটি পর্যন্ত জানা হয়নি। এটাই আমার দোষ, কারও ব্যাপারে আমি তেমন কৌতুহল দেখাতে পারি না। অপর দিকের অবস্থা হয়তো আমার বিপরীত, সে হয়তো কিছুই ভাবছে না, আমি অযথা ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছি। আবার মনে হলো আমি এত কিছু কেন ভাবছি। সে যেই হোক না কেন আমার তাতে কি দরকার। তাছাড়া আমার সঙ্গে তার আলাপের এতো আগ্রহ কেন? এত কিছু ভাবতে ভাবতে ছুটির ঘণ্টা বেজে গেলো।

বাড়িতে ফেরার পর মেজদি বলল, কাপড়-চোপড় ছেড়ে আয়, চা খাবি। মেজদি আগে থেকেই আদর আপ্যায়ন ও সাংসারিক কাজে দক্ষ ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের ভাইবোনদের যত্ন নিয়ে থাকে। সংসারের প্রতিটি সদস্যের প্রতি তার সদয় দৃষ্টি। মা আছেন মাতৃরূপে, সবার কল্যাণ কামনা করেন। সংসারের সর্বাঙ্গীণ তদারকী করে থাকেন। আমরা তিনবোন বড়, দুই ভাই ছোট। ভাইরা এক একজন আমাদের আদরের টুকরো। ওরা যেমন এক মুহূর্ত আমাদের চোখের আড়াল হতে চায় না, আমরাও তেমন ওদের চোখের আড়াল করতে চাই না। ভাই-বোনদের মধ্যে খুব শক্ত বন্ধন। এ বন্ধন ছিঁড়ে ফেলার শক্তি কারও নাই।

আমি বোনদের মধ্যে ছোট। দিদিরা আমাকে খুব আদর করতো। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়েছি, তখন আমি দশম শ্রেণিতে পড়ি। বোনদের প্রচেষ্টায় এতদূর লেখাপড়া হয়েছে। বড়দির ম্যাট্রিক পাসের পরপরই বিয়ে হয়ে ভারতে চলে গেছে। তবুও আমাদের প্রতি খেয়াল ও যত্নের ত্রুটি করেনি। পিতৃহীন পরিবারে দিদিরাই সংসার চালাচ্ছিলো। আমাকে টিউশন করে লেখাপড়ার খরচ চালাতে হতো। আমি কাজ করতে করতে কখনও ক্লান্ত হয়ে পরতাম। আর এর মধ্যে যদি আদর ও স্নেহের ছোঁয়াচ পাই তাহলে তো আরও নবোদ্যমে আবার কাজ করতে পারি। এভাবেই চলছিলো। মেজদি একটা গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করতো।

আমার আনন্দময় ও সুখময় জীবনে এসে যোগ দিলো আর এক সুখকর জীবন। আমিতো ভাবতেই পারিনি আমার হিরো, এত রোমাঞ্চ জানে, জানে এতো ভালোবাসতে। যখনই দেখা হতো শতলোকের মাঝেও তার মিষ্টি মধুর ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করবেই। একদিন তো বলেই ফেললো আমার সখিকে প্রিয়তমা সম্বোধনে আমি ডাকবো না তো কে ডাকবে? সবার সামনে লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠলো। আমি বিয়ে করার পক্ষপাতি কোনো দিনই ছিলাম না। তাছাড়া কে আমাকে বিয়ে করবে? এমন কালো মা কালির জন্য কে আগ্রহ নিয়ে আকাঙ্ক্ষা করে বসে আছে যে প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা দেখিয়ে বরণ করে সোহাগের

জায়গায় বুকে তুলে নিবে? তাই আমি ওসব বিষয়ে নির্লিপ্তই ছিলাম এতকাল। কিন্তু কে ঐ ছেলে যে হঠাৎ করে ঝড়ের বেগে এসে এক ঝটকায় আমাকে আমার আসন থেকে একেবারে ভূপতিত করে দিলো?
আমি কুমুদিনী কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেছিলাম। শুধু অধ্যাপনাই নয় সাংস্কৃতিক দিকটাও আমাকে দেখতে হতো। টাঙ্গাইলের কুমুদিনী মহিলা কলেজ, মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতাল ও ভারতেশ্বরী হোমস রণদা প্রসাদ সাহা নামে একই ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। দানবীরের জন্মদিন উপলক্ষে অনুষ্ঠান সাতদিন চলে। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উক্ত অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠানের মেয়েরা নানাভাবে নানা অনুষ্ঠান করে থাকে। কুমুদিনী কলেজের অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো আমার উপর। মির্জা হলে যে অনুষ্ঠানটি দেখানো হবে, সেটাই রিহার্সেল দিচ্ছিলাম। হঠাৎ করে তাকিয়ে দেখি সেই লোকটা। আমি মঞ্চ থেকে নেমে উনার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি যে এখানে কেমন করে?
– আপনি যে কারণে এখানে আমিও সে কারণেই এখানে। আমি অধৈর্যের সাথে বললাম, খোলসা করে বলুন না। একটু হেসে সে বলল, এত উতলা হলে চলবে, বলছি শুনুন, আমি কুমদিনী হাসপাতালের একজন সামান্য ডাক্তার এবং সঙ্গীত শিল্পীও বটে। আপনার রিহার্সেল শেষ হলেই আমার অনুষ্ঠান শুরু করবো। যাক ভাগ্যক্রমে আবার দুজনের দেখা হলো। ভালই হলো। আপনার নাম?
– আমার নাম অনুরাধা দাশ গুপ্তা, দয়া করে আপনার নামটা বলবেন কি?
– হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই বলবো, আমার নাম মো. আতোয়ার রহমান।
আমি বললাম, জেঠামণির জন্মদিনের অনুষ্ঠানে এখানেই তো আছি, আশা করি আবার দেখা হবে।
আমার ঠাঁই হলো ভারতেশ্বরী হোমসের ভিতরে। যখন কাজকর্ম না থাকে তখন হোমস থেকে বাইরে চলে আসি, কখনও নদীর পার দিয়ে ঘুরি। ঘুরতে ঘুরতেই রহমানের সাথে দেখা হলো। ডাক্তার হলে কি হবে, ভয়ানক কাব্য জানে, কথার মধ্যে রোমাঞ্চ ভর্তি। ওর সুমধুর মিষ্টি শব্দের মধুর রাগিনীতে আমি যেন কেমন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি। ওর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখনও কখনও আমি কেমন অন্যমনস্ক হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাই, যখন সম্বিৎ ফিরে পাই তখন নিজেরই লজ্জা করতে থাকে। মনে মনে বলি রহমান কি বুঝতে পেরেছে আমার মনের কথা। এটা ভেবেই আরও বেশি করে লজ্জা পেয়ে চোরের মত পালিয়ে আসতে চেষ্টা করি। রহমান আমার হাত দুটি টেনে ধরে একেবারে বুকের মধ্যে আমাকে মিলিয়ে ফেললো। এই আমার প্রথম যৌবনে কোন যুবকের প্রথম ছোঁয়া ও আদর পেয়ে আমিও ওকে ধরে ওর বুকে মিশে একাকার হয়ে রইলাম।
যে কয়দিন আমি মির্জাপুর ছিলাম, সে কয়দিনই কি যেন একটা টানে রহমানের সাথে দেখা না করলেই ভালো লাগতো না, শুধু দেখা কেন ফোনেও আমি ওর মধুর গান শোনার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলাম। ফোনেও কথা হতো। তবুও যেন আমি তৃপ্ত হতাম না। বারবার ভাবতাম সে কখন আসবে, দু'জনে দু'জনের কুশল বিনিময় করবো। আমার প্রচুর সময় ছিলো, ছিলো না সময় আমার হিরোর। নানা কাজে সে ব্যস্ত থাকে। তাঁর একটাই চিন্তা ছিলো, সেটা হলো কি করে বড় হওয়া যায়, প্রায়ই ভাবত সে যেন একজন নামকরা ডাক্তার হতে পারে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে বিলাসিতার দিকে আকর্ষণ না থাকলেও ছোটখাটো চাওয়া পাওয়ার চাহিদা ছিলো প্রবল। আমাকে বলেছে আমার হিরো সে বড় হতে চায়। মানুষের উপকার করতে চায়। আর সে মনে মনে ভাবতো সুবর্ণতলী নামে একটা সাধারণ গ্রামের ছেলের এতবড় আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বর পূরণ করবেন? তার আর একটা আকাঙ্ক্ষা ছিলো, তার রাধাকে সে কীভাবে সুখি করবে। তার ইচ্ছে করে রাধার সুখের জন্য সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য তার কাছে এনে দিবে। একথা যখন রাধাকে বলে তখন রাধা লজ্জায় দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বলে, হায়রে আমার পাগল তাই কখনো হয়! মাঝে মাঝেই আমার হিরোকে দেখতাম সে উদাস নয়নে বসে বসে কী যেন ভাবতো! এটা দেখে আমার খুব কষ্ট হতো। কি ভাবে সে কার কথা ভাবছে? আমাকে ভুলে যাবে নাতো? আবার ভাবতাম কি করে যাবে? আমিতো ওকে হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে একান্ত আপন করে ভালোবেসেছি। এ বাঁধন ছিঁড়ে যাওয়াতো এত সহজ নয় তবুও ওর উদাসীনতায় মন মানাতে পারতাম না। আমিও যেন কেমন ভুলভাল বকতে থাকতাম। আমার সহকর্মীরা ঠিকই বুঝতো, বলতো এই অনুরাধা এত ব্যাকুল হচ্ছিস কেন? রাস্তার দিকে আঙ্গুল

তুলে বলল, রূপবান তোমার রহিম এসেছে, তাকিয়ে দেখ। বা বা দুইদিন দেখা হয়নি বলে এতো উতলা হয়ে আছে। সত্যিই আমার হিরোকে স্বচক্ষে দেখতে গিয়ে চোখে জল নেমে এলো। দু'হাত দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে আমি দৌড়ে গিয়ে ওর হাত দুটি ধরলাম, আমার হিরো আলতোভাবে ডান হাত আমার কাঁধে রাখলো। মনে হলো যেন আমার হৃদয়াকাশে শীতলতার ছোঁয়াচ পেলাম। আপনা আপনিই এরকম করে আমাকে শাস্তি দিত। মনে ব্যথা পেয়ে রাগটা আমার আরও প্রখর হতো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম, হিরোর সঙ্গে জীবনে দেখাও করবো না। কথাও বলবো না। তাই কি হয় কোনদিন পেরেছি কি কথা না বলে থাকতে? যখন কাছে এসে দাঁড়াত আমি সব ভুলে আদর করে আমার কাছে বসাতাম। হিরো যখন কথা বলতে শুরু করতো, আমিতো সেই মিষ্টি কথার মাদকতায় নিজের প্রতিজ্ঞার কথা এমনকি একটু আগের কথাও কেমন করে যেন ভুলে গেলাম। এত আন্তরিকতার সাথে আলাপ করতাম। লোকে শুনলে ভাববে এ কি সেই রাধা যে হিরোর দর্শনে এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো?

আমি থাকতাম টাঙ্গাইলে আর আমার হিরো থাকতো মির্জাপুরে। হিরোর অভাব আমি বেশি অনুভব করি। আর হিরো দিব্যি ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় দিনমান কাটিয়ে দিচ্ছে। আমিতো ওর চিন্তায় উদ্বিগ্ন থাকি। কিন্তু আমার হিরার সে বিষয়ে কোন হেলদোল নেই বলে মনে হতো। আমি ভীষণ অভিমান করে মোবাইল বন্ধ করে রাখলাম। সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে রাখলাম। ১৫ দিন এভাবে যোগাযোগহীন অবস্থায় থেকে ভাবলাম, ছুটি নিয়ে কোথাও বাইরে বেড়াতে যাবো। টাঙ্গাইল থেকে ব্যাগ নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে মাত্র পৌঁছেছি। বাসস্ট্যান্ডেও সাধারণত ভিড় থাকে, ঢাকার গাড়ির কাছে রিকসাওয়ালাকে নিয়ে যেতে বললাম, পাশে তাকিয়ে দেখি কোন এক ভদ্রলোক আমার পাশে এসে বসলো। চমকে গিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেলাম। অমনি আমার হাতটা ধরে বলল, একি পাগল নাকি, চলন্ত গাড়ি থেকে নামতে গেলে এক্সিডেন্ট হবে না! বসো চুপ করে। ধমক দিয়ে কথা বলা আমি মোটেই পছন্দ করি না। ধমক শুনে আমার দু'চোখে জল চলে এলো। রিকসাওয়ালাকে বললো, যেখান থেকে এসেছো সেখানেই নিয়ে চলো। আমার রাধা, রাধা তুমিতো এমন অবুঝ নও। স্ট্যান্ডে দেখ কত লোক প্লিজ, সিনক্রিয়েট করো না বলেই এত লোকের মধ্যে রিকসাতে আমায় কোলে নিয়ে বসলো আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম কিন্তু রাগ কমলো না। আমিও আস্তে আস্তে বললাম, আমাকে এখন আর আদর দেখাতে হবে না। এ কয়টা দিন আমার কাছে না এসে ফোন না করে কেমন করে থাকলে? আমি ফোন করলে ফোন কেটে দিয়ে ব্যস্ত দেখাতে। আমার দরকার নেই এ ভালোবাসার। যে ভালোবাসা শান্তির চেয়ে দুঃখই দেয় বেশি তার দরকার কি? আমি মনের আবেগে কাঁদছি আর চোখ মুছতে মুছতে দেখছি তার কাজ সে ঠিকই করছে, রিকসা ঘুরিয়ে বাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আগেই বলেছি তার ছোঁয়ায় যেন কেমন যাদু আছে। তার কথায় যেন কেমন মাধুর্য আছে, দুঃখে চোখের জল মুছে আমি স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। বললাম, তুমি এখন তোমার বাড়ি যাও, শান্ত হয়ে স্বাভাবিক হয়ে বিকেলে এসো তোমার রাধাকুঞ্জে, তখন সব ফয়সালা হবে।

– আমিতো শান্ত ও স্বাভাবিকই আছি। তুমিই যেন কেমন হয়ে আছো।

– কেমন হবো না? বলতো কতদিন তোমার দেখা পাই না, তোমার রাধাতো এ হেন নির্দয় নয়, তোমা বিনে সে তো অশান্ত হবেই। শেষ পর্যন্ত আমাকে নানা কথার জালে নানা প্রলোভন দেখিয়ে কুপোকাত করে ফেলল। বা-বা-রে কি সম্মোহনী শক্তি। আমি সত্যিই অন্য মানুষ হয়ে গেলাম, সে যা বলছে আমি তাই হ্যাঁ করছি, আমার সঙ্গে আমার হিরো এমন ব্যবহার করে যেটা আমার মত মেয়ের পক্ষে সহ্য করা খুবই কঠিন। সেই কঠিন পদার্থকেও হিরো গলিয়ে জলবৎ করে দেয়। ওর বন্ধুদের যখন ওর নিষ্ঠুরতার কথা বলে থাকি এবং আজীবন কথা বন্ধ করে দিব বলি। ওরাও তখন বলে, পারবে না তুমি। সত্যিই তাই। রিকসা থেকে আমাকে নামিয়ে নিজে ঐ রিকসা করে বাই বাই করতে করতে চলে গেলো। তখন রাগে দুঃখে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছিলো, সেটাই তো ভালো করেছিলাম আর দেখা হতো না।

২

বাড়িতে প্রথমে টের পেয়েছিল আমার মেজদি। আমি আর মেজদি একই ঘরে শুতাম। প্রতিরাতে আমার হিরোর মোবাইলে কথা না বললে হতো না, আমি বলেছিলাম, মেজদি আর আমি এক ঘরে শুই। যদি বুঝে

তাহলে কি হবে? আমিতো লজ্জায় মরে যাবো, রাতে ফোন করো না। দিনে ফোন করবে। একথা শুনে দারুণ রাগ করে বলল,
– আমার রাধার সঙ্গে আমার কথা বলতে সময় বেঁধে নিতে হবে নাকি? আমার রাধার কাছে যখন খুশি তখন যাবো, যখন ইচ্ছে হবে তখনই কথা বলবো। শোন তুমি চলে এসো আমি এখনই তোমাকে বিয়ে করবো। মেজদির জন্যই তো আমি আটকা পড়ে আছি নইলে কবে তোমাকে পালকি করে আমার প্রিয় গ্রাম সুবর্ণতলী নিয়ে তুলতাম। মাও খুব খুশি হতো। মা এমন একটা মেয়েই খুঁজছিলো তার পুত্রের জন্য।
আমাকে কিছু না বলে একদিন সুবর্ণতলীতে নিয়ে গিয়েছিলো। আমি হিরোকে বলেছিলাম তোমার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যেও। বাবা মাকে না বলে। আর সে করলো কি বাবা-মাকে আমার কথা ঠিকই বলে দিলো, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, একথা আমার কাছে বললো না। মাটির রাস্তা বর্ষায় রাস্তাঘাট জলে ডুবে যায়, জায়গায় জায়গায় কর্দমাক্ত হয়ে যায়। রিকসা নিয়ে দুজনে রওনা হলাম, আমি জানি না কোথায় যাচ্ছি, আমি আমার হিরোর সঙ্গে জাহান্নামে যেতেও আনন্দ পাই। আমার একটা বিশ্বাস আছে ওর উপর আমি জানি। আমার হিরো সর্বদাই আমার মঙ্গল চায়, রিকসাটা বাড়ির গেটে থামিয়ে আমাকে নামিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে মা মা বলে ডাকতে বাড়ির ভিতরে ঢুকলো। ওর মা ডাক শুনে আমি যেন কেমন থমকে গেলাম। ওর হাত ধরে বললাম, কোথায় নিয়ে এলে। আমাকে বললে না কেন?
– বলিনি তাতে কি হয়েছে?
– বললে আমি প্রস্তুতি নিয়ে আসতাম।
– প্রস্তুতি নিবে মানে, একবারে চলে আসতে এখানে?
– আরে না না খালি হাতে আসতাম না।
মা উঠোনে এসে প্রথমে আমাকে ধরে বলল, আমার মাকে নিয়ে এসেছিস? এসো মা, ভিতরে এসো।
পাশে বাবাও দাঁড়িয়ে আছেন। আমি বাবা-মাকে প্রণাম করলাম। হিরো দু'পা এগিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে প্রণাম করবে না?
আমিও এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে নিলাম। তাতে মনে হলো মা সন্তুষ্ট হলেন। মা-বাবা দুজনেই তাদের ছেলের কীর্তি দেখে হেসে উঠলো, মা আমার হাত ধরে ঘরে নিয়ে আদর করে বসাল। হিরোর দু'বোন আমার পাশে গা ঘেঁষে বসলো। আর নানা কথা বলতে লাগলো। ওরা কি বলবে ওরা তো ছোট, আমিও ওদের গা মাথা হাতিয়ে আদর করে দিলাম। সকালে গিয়ে সারাদিন ওখানে থেকে ঘুরে ঘুরে বাড়িটা দেখলাম। আমার হিরো বলল, ভালো করে সব দেখে নাও, এখানেই তো তোমাকে থাকতে হবে। তোমার হিরো তো এর চেয়ে ভালো জায়গায় তোমাকে রাখতে পারবে না। আমি ওর মুখ চেপে ধরে বললাম, চুপ করো। আমার হিরো সফল হবেই এত আকাঙ্ক্ষা এত চেষ্টা যার মধ্যে আছে সে ব্যর্থ হতে পারে না। তার প্রতি সবার আশীর্বাদ আছে। বাবা এসে বললেন, তাই যেন হয়, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।
রুবি ও রোজী দুইবোন এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি তাড়াতাড়ি আবার এসো। দাদা ভাই তুমি আবার দিভাইকে নিয়ে এসো।
মা-বাবা গেট পর্যন্ত এসে বলল, তাড়াতাড়ি আবার এসো মা। যতক্ষণ হিরোর গ্রামের বাড়িতে ছিলাম, ততক্ষণ আমার এত ভালো লেগেছিলো মনে হচ্ছিলো এক শান্তির নীড়ে এসে পৌঁছেছি, সবাই আমাকে এত আদর করে এত কাছে টেনে নিবে ভাবিনি। পরিবারের সবার ব্যবহার এত ভালো, তাদের ছেলের ব্যবহার ভালো হবে না কেন?
আমার হিরোকে দেখেছি কোন কাজে ঢাকায় গেলে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি উঠবে না। ওর একটা নির্দিষ্ট হোটেল আছে ওখানে উঠে। ওখানে থাকতে থাকতে স্টাফ ম্যানেজার থেকে বয় পর্যন্ত সবার কাছেই সে সুপরিচিত।
সবাই ওকে যেমন খাতির করে তেমনি আদর যত্নও করে থাকে। আমি কোন কাজে ঢাকায় গেলে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতেই উঠি, তাতে হিরোর ভীষণ রাগ হয়। আমি তো হোটেল মোটেল-এ কোনোদিনও থাকি না এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধও করি না। না করলে কি হবে কর্তব্য কর্মতো করতেই হয়, হিরো আমাকে যা বলে আমি নির্দ্বিধায় তাই করি।
হিরো বলল, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?
বললাম, একশত পার্সেন্ট বিশ্বাস ও ভরসা করি। আমি যদি তোমাকে বিশ্বাস ও ভরসা না করি তবে এ দুনিয়াতে কাকে বিশ্বাস করবো? আমার সাতজন্মের সাথীকে আমি কি কখনও অসম্মান করতে পারি। তুমি যেখানে যেতে বলবে যা করতে বলবে আমি তাই করব। তোমার কথাই

আমার কথা, তোমার পছন্দই আমার পছন্দ। ঠিক আছে তোমার পছন্দমত এত বড় সিঁদুরের টিপ কপালে পরে তোমার গালে গাল ঠেকিয়ে বড় করে ছবি তুলে বাঁধিয়ে রাখবো। যখন আমি থাকবো না তুমি ছবিটা দেখবে আর অঝোরে কাঁদবে আমি উপর থেকে দেখবো আর হাততালি দেবো।

– এ তুমি কি বলছো? রাধা তোমার হিরো ব্যথা পাবে আর তাতে তুমি খুশি হবে, এটা কি হতে পারে বল, বল রাধা। রাধা বিনে হিরো শূন্য। তোমার হিরোকে পরিপূর্ণ করার দায়িত্ব তোমার। ও রাধা, রাধা, কথা বলো।

রাধা তার হিরোর কাছে গিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললো, তোমার সঙ্গে মজা করছিলাম, তুমি তো এতো সহজে ভেঙে পড়ার ছেলে নও। আমিতো তোমার কাছেই আছি।

চোখ মুছে হিরো রাধার কোলে মাথা লুকিয়ে আদর সোহাগ উপভোগ করছিল আর দুহাত দিয়ে রাধার কোমর জড়িয়ে ধরে বলছিল, বল রাধা আর কোনদিন তোমার সূর্যকে এমন কষ্ট দিবে না, যাতে সে মর্মাহত হয়। রাধা দু'হাত দিয়ে হিরোর মুখটা তুলে ধরে সুন্দর করে চুমু খেলো। আর রাধার হিরো ভালোবাসার চুম্বন গ্রহণ করে মৃদুকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি শুরু করলো, 'অয়ি প্রিয়ো

চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া

বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ'

দুজনে সুখের সাগর থেকে অবগাহন করে হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালো। হিরো বলল, বলতো এখন কি চাই?

– তোমার কি চাই সেটা কি আমি বুঝি না?

– তুমি যদি না বুঝবে আমার মনের কথা তবে কে বুঝবে?

– না ও অনেক হয়েছে। কথাটাকে বাধা দিয়ে হিরো বলল অনেক আবার কি হলো? তুমি তো কিছুই করতে দিলে না, শুধু শুধু আমার চোখে জল ঝরালে।

– এখন শান্ত হয়ে বসো, আমি তোমার জন্য ধূমায়িত চা নিয়ে আসি। দুজনে চা পান করবো, আর বসে বসে ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করবো।

– তুমি চা করবে কি? আমার তো কাজের লোক আছে ওকে ডেকে দেই।

– না, সে নেই তাকে একটু বাইরে পাঠিয়েছি।

– তাই বলো।

চা করে যখন ওর হাতে সদ্য তৈরী চা দিলাম, ওর সেই স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ডান হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে তেমনি করে চা পাত্রটি নিয়ে টেবিলে রেখে আমার পাত্রটি আমার হাতে দিয়ে অধরে অধর ঠেকাতে গেলেই আমি ওখান থেকে সরে গেলাম। রাগান্বিত স্বরে আমাকে বলল,

– এই না একটু আগে আমাকে বললে আমি যা বলবো, তুমি তাই করবে। এই এখন ব্যতিক্রম হচ্ছে কেন? ভালো হবে না।

– চা পান করো, তারপর অন্যকথা, পাগল আমার। আমার হিরোর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হবে দেশে-বিদেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়বে। তার কাজের অন্ত নেই। সে নিজেও বিশ্বাস করে একদিন সে সফল হবেই। তার পরিশ্রমের অন্ত নেই, দিনরাত সে সভা সেমিনার নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আজ ঢাকা, কাল রাজশাহী, পরশুদিন চট্টগ্রাম ডাক্তারি বিষয় নিয়ে তার গবেষণার অন্ত নেই, আজকাল আমার সঙ্গে কাজ পাগল লোকটার দেখাই হয় না। আমিও অভিমান করে ফোন করি না। বেশ কয়দিন চলে যাওয়াতে হিরোর টনক নড়লো। এতদিন তো এমন নিশ্চুপ থাকার কথা নয়, দুদিন তার হিরোর ফোন না পেয়ে সে উতলা হয়ে উঠে, কিছু হয়নি তো? ভালো আছে তো রাধা। হিরো এমনিতেই রাধা অন্তপ্রাণ। তা হলে কি হবে। কাজের চাপে কর্তব্যকাজও করতে পারছে না। দিনে সময় না পেলে তো রাতে সময় করে নেবে, তারও উপায় নেই। খুব ইচ্ছে করছে রাধাকে দেখতে। ফোন করলো, রিং বেজে বেজে থেমে গেলো। তাতে হিরোর ভাবনা আরও বেড়ে গেলো। ফোন ধরছে না কেন? তিন চারবার ফোন করার পর আমি ফোন কেটে দিলাম। ওপারে বলে উঠলো ব্যস্ত আছে। শেষবার ফোন ধরে বললাম, বুঝতে পার না আমি ভীষণ ব্যস্ত আছি। বারবার কেটে দিচ্ছি আর বারবারই ফোন করেই যাচ্ছো। আমার কথা শুনে এমন ভাব দেখালো যেন ওর সঙ্গে আমার কিছুই হয়নি। অট্ট হাসি দিয়ে জোরে জোরে বললো, ও দুষ্টু প্রতিশোধ নেওয়া হচ্ছে বলেই আমার ঘাড়ে ফু দিল, আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার হিরো আমার অতি নিকটে, আমি ফুল নিবো না মালা নেবো ভেবে হই আকুল।

আমার হিরো পিছন দিক থেকে চোখ চেপে ধরে বলল, আমি এসেছি। আমি ওর হাত দুটো আকড়ে ধরলাম। সে যে কি আরাম, কি সুখ।
হিরোকে হাত ধরে সোফায় বসিয়ে আহ্লাদের সুরে বললাম, টাঙ্গাইল থাকবে তো কয়েকটা দিন। আবার না করো না।
– না গো থাকার উপায় নেই। তুমি রাগ করো না গো।
– না, রাগ করবো না। তুমি কবে আমার জন্য এখানে আসো।
– এ কি কথা। টাঙ্গাইল মানেই তুমি। টাঙ্গাইল আসা মানেই তোমার সাথে থাকা।
– হু তোমার সাথে থাকা। সমস্ত কাজ শেষ করে সবার প্রয়োজন মিটিয়ে যদি সময় থাকে তাহলে আমার কাছে আসো। সময় না থাকলে দেখাও নেই। এইতো তোমার টাঙ্গাইল আসা মানেই আমার কাছে থাকা। যাও এটাই আমার জন্য উপযুক্ত সম্মান।
– ওগো আমার প্রিয়তমা, করিও ক্ষমা। আর এমন ভুল হবে না। ঢাকা থেকে এসে আগে তোমার কাছে আসবো। আমার প্রিয় মুখ রাধা মুখ আগে দর্শন করে তারপর অন্য কাজ তাহলে হবে তো?
– সত্যি বলছো?
– সত্যিই তো বলছি, সত্যি না বললে রাধাকে পাবো কি করে? আমি বিদেশ যাওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছি, মাঝে মাঝে বাড়ি আসতে একটু আধটু দেরী হতে পারে তুমি আমার উপর আস্থা হারিয়ো না। তুমি না সবসময় বলো আমাদের দুজনের সাতজন্মের বন্ধন, তবে একটু অদর্শনে এমন অস্থির হয়ে উঠ কেন? আমি তো তোমার ছিলাম, তোমার আছি আর চিরকাল থাকবই।
– তার চেয়ে একটা কাজ করলে ভালো হয় না, তুমি অতিসত্বর আমাকে তোমার নিজের করে নিতে পারো না?
– হ্যাঁ পারি, তুমিই তো বলেছো তোমার মেজদি তোমার বাঁধা। মেজদির বিয়ে হয়ে গেলেই রাস্তা পরিষ্কার। তাই আগে রাস্তাটা পরিষ্কার কর। আর আমার একটা বাঁধা আছে। সেটা হলো আমাকে উপরে উঠতে দাও, তারপর ঢাকায় তোমার মন মত সাজানো গোছানো বাড়ি করবো তারপর না বিয়ের ভাবনা।
– ভাবনা আমার করা হয়েছে, তাছাড়া আমার টাকাতো তুমি নিবে না। আমার অনেক টাকা আছে তুমি তা জানো না। তাছাড়া শহরে আমাদের দু'বোনের বাড়ি করার মত জায়গাও আছে। তোমাকে কোন চিন্তাই করতে হতো না, যদি ওগুলো নিতে।
– ওগুলোর কোন দরকার হবে না, আমি পেতে চাই ডিগ্রি নাম যশ। যা শুধু নিজের অর্জনে করা যায়। তুমি শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর তোমার হিরো যেন জীবনে সফল হয়। তোমার মুখ যেন উজ্জ্বল করতে পারে, আমার জীবনের প্রথম পুরস্কার তোমাকে উপহার হিসেবে দিয়ে আমি কৃতার্থ হবো।
– আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার তুমি প্রিয়তম, আমার আর কোনো কিছুর দরকার নেই। তোমার উপস্থিতিই আমাকে শান্তি ও আনন্দ এনে দেয়। একটা কথা শোনার আগ্রহ হচ্ছে বলো না গো প্রথম দিন আমার মুখের দিকে ওমন করে তাকিয়ে ছিলে কেন?
– তোমার মুখের দিকে নয়, দুটো কালো চোখের ভিতর দেখছিলাম আমার নিরাপদ আশ্রয় ও শান্তির নীড়। নীল সাগরের সুশীতল জলে অবগাহন করতে চেয়েছিলাম। এই ভেবে চোখ ফেরাতে পারিনি।
আমার হিরোকে নিয়ে আমার যে কি চিন্তা সেটা সে কোনোদিনও অনুভব করতে পারবে না। আমার মনে হয় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই সে বেশি পছন্দ করে। এজন্য বললাম একদিন সে বলেছিল, তোমার সুখই তো আমার সুখ, তোমার আনন্দই তো আমার আনন্দ। আমার দুঃখ তারও দুঃখ।
এ অনুভূতি একজন মানুষের মধ্যে যদি থাকে তবে সেতো স্বার্থপর নয়। আমার হিরো আমাকে বলেছিল সে আমার সূর্য। তার নিরুত্তাপ চন্দ্রকে উত্তাপিত করার জন্য তাপ দান করে তাকে সচল ও স্বাভাবিক করে তুলে। তাই আমার হিরোকে মাঝে মাঝে লোকের কাছে বলি ওর নাম সূর্য। তখন হিরোর মুখচ্ছবিতে ফুটে উঠে তৃপ্তির ভাব, যেটা একমাত্র রাধাই অনুভব করতে পারে। ইচ্ছে করে ঐ দুটি ঠোঁটে আমার অধর চেপে তাকে সুখ সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যাই। তৎক্ষণাৎ আবার ফিরে আসি এই ভেবে যে, একে একবার এমন জায়গায় এসে উৎসাহিত করলে আর ঠেকিয়ে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই নিজের সুখের জন্য মাথাটা আমার একান্ত সুখের জায়গা হিরোর বুকে লুকিয়ে চোখ বন্ধ করে নির্লিপ্ত মন আরাম উপভোগ করতে থাকি। আর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তার বুকের উঠানামা উপলব্ধি করি, আমাকে এতো কাছে পেয়ে আমার

হিরো শান্ত-শিষ্ট বালকের মত আমার মুখপানে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো। অবোধের মত ওর তাকানো দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম কি দেখছো?
হাত দিয়ে গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, তোমাকে দেখছি, আমার রাধাকে। শীত শেষ হয়ে বসন্ত দ্বারে জাগ্রত হয়েছে, বসন্তরাজ ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় মোহনীয় মূর্তিতে মনোরম সাজে সেজেছে। এতদিন তোমাকে না দেখে আমার ভীষণ দুঃখ হচ্ছিলো তাই বাধ্য হয়ে আইএ পরীক্ষার খাতা আনতে ঢাকা রওনা হলাম। উদ্দেশ্য আমার হিরোর চাঁদ মুখখানা নয়ন ভরে দেখে এতদিনকার বিরহ বেদনার জ্বালা থেকে মুক্ত হয়ে তৃপ্তি পাবো। সেটা কি আমার লোকটা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারবে? আমি কোন সুযোগই ছাড়তে নারাজ। ঠিক ঠিক আমি যখন ঢাকা গিয়ে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম তখনই দেখি আমার সুপার হিরো আমার মুখের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তো খুশিতে আটখানা হয়ে লাফিয়ে নামতে গেছি, আমার শান্ত মেজাজী হিরো আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বললো, উহু উহু। আস্তে আস্তে নামো পা দুখানির কিছু হলে আমার কি হবে? আমিতো তাহলে অনেক পিছিয়ে যাবো। তার চেয়ে বাপু তুমি ভালো থাকো। আমিও আমার কাজে তরতর করে এগিয়ে যাবো। তারপর দুজনে একত্রে সোনার ভেলায় চড়ে জীবন যুদ্ধেও সবার আগে অসীম সাহস নিয়ে লক্ষ্যে চলে যাবো। বলতো সেটা কেমন হবে?
– সেটাই তো তোমার আকাঙ্ক্ষা, আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার সফলতা চাই।

৩

আমার হিরো অনেকদিন হয় টাঙ্গাইল আসে না। নিয়মিত ফোনও করে না। অন্যসময় হলে আমি হিরোর বিরহে আধমরা হয়ে যেতাম। ওর দিকে মনোযোগ দেবার আমারও তেমন সময় ছিলো না। তখন রাজনীতির উত্তপ্তটা এত বেড়ে গিয়েছে। ঘরে বসেও শান্তি পাচ্ছিলাম না। ছোট ভাই রঞ্জন মাত্র কলেজে ঢুকেছে সামনে পরীক্ষা। টাঙ্গাইলের রাজনীতি অন্যরকম। যখন আন্দোলন শুরু হয় তখন ছাত্র জনতা সবাই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
প্রথম দিকে আমরা দু'বোন মিলে ওকে রাজনীতি থেকে দূরে আঁচলের তলায় রেখে রক্ষা করছিলাম। কিন্তু রাজনীতি এমন একটা নেশা। এ নেশায় যে একবার মজে যায় তার আর ফিরে আসার উপায় থাকে না। তাই আমরা দু'বোন খুব চেষ্টা করে ওকে ওমুখো হতে দেইনি। কিন্তু না দিলে কি হবে নেশা একবার লেগে গেলে তা থেকে উদ্ধার পাওয়া খুবই মুশকিল। আমি সেটা করেছিলাম, রঞ্জনকে ভারতে পাঠাতে চেয়ে ওকে বলেছিলাম, ভাই তুই এসময় একটু গা ঢাকা দিয়ে থাক। না কিছুতেই তাকে রাজী করাতে পারিনি। বলেছিলাম বড়দির ওখানে বোলপুর যা না। দিদির ওখানে যাবে না, জামাই বাবুর সাথে কয়দিনেরই বা পরিচয়। আমি আত্মীয়ের বাড়ি থাকতে পারবো না। আবার বললাম, না থাকলে আত্মীয়ের কাছে। দিদি কখনও আত্মীয় হয় না। না গেলে সেখানে। তাহলে শিলিগুড়ি রাঙাদার বাসায় যা সেটা তো নিজের আপন দাদার বাড়ি, সেখানে তো অসুবিধে নেই।
– না আমি কোথাও যাবো না, এখানেই থাকবো। ওখানে আমাকে কে চিনবে? এখানে দাশগুপ্ত বাড়ির ছেলে বললে নতুন করে আর কোন কিছু চিনিয়ে দিতে হয় না। এখন দেখতে পাচ্ছ রাজনীতির আকাশ গরম, আবার কয়দিন পরেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমাকে মনযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে দে দিদি, যাতে আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারি। তাতে তোদেরও মুখ উজ্জ্বল হবে এবং তোরাও খুব আনন্দ পাবি। তাই আমি ঠিক করেছি এখানেই থাকবো এবং লেখাপড়া করে ভালো রেজাল্ট করবো।
রঞ্জনের অকাট্য যুক্তির সাথে আমি হেরে গেলাম। বললাম, বেশ তোর যা খুশি তাই কর।
টাঙ্গাইলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানিয়ে হিরোকে চিঠি লিখলাম, হিরো চিঠি পড়ে খুব চিন্তিত হলো কিন্তু কোন সমাধান দিতে পারলো না। আমাকে চিঠি লিখলো তুমি ওর জন্য চিন্তা করো না। আমি কীভাবে রঞ্জনকে বুঝাবো আর আমি বুঝালেই কি সে বুঝবে? হিরো লিখলো তোমাকে দেখতে যাবার খুব ইচ্ছে হচ্ছিলো কিন্তু এমন চাপ পড়ে গেছে তাই এখন আর যাওয়া হবে না। যদি এর মধ্যে সময় করে উঠতে পারি তাহলে আমার রাধাকে একবার দেখতে যাবোই। হিরো আরও লিখলো রাজনীতি অনেকেই করে তার মধ্যে রঞ্জন করছে। তার জন্য এত চিন্তা করে অস্থির হওয়ার কোন কারণ নেই। তাছাড়া রঞ্জন তো আর ছোট

ছেলে নয়। সুতরাং তুমি ওকে নিয়ে ভাববে না, এ বয়সে যদি একবার রাজনীতি মাথায় ঢুকে যায় তবে তাকে সরানো খুবই কঠিন।
আমাদের সবার ছোট ভাই, অতি প্রিয়। তাকে আমরা অন্তর দিয়ে সবাই ভালোবেসেছি। আমাদের কষ্ট হলেও কোনদিনও কষ্ট পেতে দেইনি। সর্বদা ওকে ভালো ভালো জামা কাপড় দিয়েছি। বাইরের লোকেরা বলতো, বোনদের সমস্ত রোজগারের টাকা দিয়ে ছোট ভাইকে সাজায়। সাজাবো না, ভাইটি সামনে এসে এমন আবদার করবে ওর আদর মাখানো মুখখানা দেখলে কার না ভালো লাগে। হিরোও কিন্তু রঞ্জনকে কম ভালোবাসে না। আপন ছোট ভাই-এর মত আদর করে থাকে। রঞ্জন সম্পর্কে হিরোর মন্তব্য আমার একটুও ভালো লাগেনি। সে বলেছিল, তোমরা অত্যধিক আদর যত্ন দিয়ে রঞ্জনকে এমন করে তৈরি করেছো। যার জন্য ছেলেটা এখন তোমাদের কথা শুনতেই চায় না। তাই কি হয়? ভালোবাসা কি মানুষকে অমানুষ করে তুলে? মানুষের স্নেহ ভালোবাসা নিয়ে যুক্তি তর্ক করা ঠিক নয়, মানুষ কি ন্যায়-অন্যায় বাছবিচার করে ভালোবাসতে পারে? ভালোবাসা অতি দুর্লভ। আমি জানি ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে অমানুষ থেকে মহামানবে রূপান্তরিত করা যায়। আমরা আমাদের ভাইকে আপনা থেকে মনে থেকেই ভালোবেসেছি। যারা ভালোবাসতে জানে না তারা এর মর্ম বুঝতে পারে না। রঞ্জনকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন, রঞ্জনের গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগতে দেইনি, ভাইটি কোথাও ব্যথা পেলে মনে হতো আমার পাঁজরের একটা হাড় ভেঙে গেছে। আমরা কোনদিনও ওর গায় হাত তুলিনি। যথেষ্ট যত্ন সহকারে ওকে মানুষ করেছি। কলেজে যখন পড়ে তখনও ওকে খাইয়ে দিয়েছি। মা মাঝে মাঝে রেগে যেতো। বলতো তুই না বললি তোর কলেজে যেতে দেরী হয়ে যাচ্ছে, আবার ওকে খাওয়ালে দেরী হবে না? তুই এখন ওঠ দিদিকে খেতে দে। সত্যি সত্যি খাবার রেখে উঠে ছলছল চোখে ঘরের কোণে দাঁড়ালো, আমি ডাকলাম আয় খেয়ে যা, মাথা নিচু করে বলল, না খাবো না।
– এইতো রাগ হলো তো? মা, তুমিও যেন কেমন রঞ্জন যদি খাওয়া রেখে উঠে যায় তবে আমি কি করে খাবো?
– এভাবেই আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছো।

আমি উঠে ওকে আদর করে খাইয়ে দিলাম। এইতো আমার ভাই অভিমানে ভরপুর। এত আদরের ভাই কখনও ভালোবাসা পেয়ে বিগড়ে যেতে পারে। তা কখনও হবে না। হিরো এটা তোমার ভুল ধারণা। তোমার তো বড় বোন নেই। বড় বোনরা (দিদি) ছোট ভাইদেরকে সন্তানের মত স্নেহ আদর করে। যে এমন আদর পায়নি সে কি করে বুঝবে এমন ভালোবাসার কদর। তাই বলে আমার হিরোকে কোনরূপ দোষারোপ করছি না।
অনেকদিন হয়ে গেলো, আমার হিরোর কোন পাত্তাই পাচ্ছিলাম না। তিনখানা চিঠি দিয়েছি, উত্তর নেই। কতবার যে ফোন করেছি তারও কোনো উত্তর নেই। নাইবা থাকলো হিরোতো বলেছেই আমি ব্যস্ত আমার কাজে। আমি সম্ভাবনার পিছনে ছুটছি, অনেক দূর এগিয়েছি। তুমি প্রার্থনা করো তাহলেই আমার সফলতা আসবে। আমার কষ্টের অবসান হবে। একমাত্র তোমার প্রেরণাতেই আমি এত দূর এসেছি।
বারবার ঢাকা যেতে হয়, থাকতে হয়, কত কষ্ট। তাই একদিন ওর দুটো হাত ধরে বললাম তুমি ঢাকাতে একটা বাড়ি নাও, আর একটা বেয়ারা নাও। লোকটি তোমার আদেশ পালন করবে আবার ফুট ফরমায়েসও খাটবে এবং তোমার সর্বাঙ্গীণ দেখাশুনা করবে। যাতে তোমার কোন অসুবিধা ও কষ্ট না হয়। বাড়ি ঠিক করে আমাকে খবর দিবে আমি ওখানে গিয়ে তোমার মনের মত করে ঘর সাজিয়ে দিয়ে আসবো। আর দেখ অভিজাত এলাকাতেই যে বাড়ি করতে হবে তা কিন্তু নয়। এখনও এত বিলাসিতা দেখানোর সময় আমাদের হয়নি। ভগবান যদি মুখ তুলে চায় তাহলে সব হবে। তুমি চিন্তা করো না ও অযথা মন খারাপ করো না।
হিরো আমার আরো কাছে এসে আমার হাতে হাত রেখে বলল, তুমি যেমন চাইবে তেমনই হবে। আমার রাধাকে আমি সুখি করতে চাই। তবে এখনও আমি উঠে দাঁড়াতে পারিনি। তোমাকে আমি সুখি দেখতে চাই।
ওর কথা শুনে আমি গান ধরলাম, তুমি খুশি থাকো আমার পানে চেয়ে চেয়ে খুশি থাকো।

সোফা থেকে একলাফে উঠে আমার কাছে এসে আলতো করে ঠোঁটে চুমু খেয়েই সরে গিয়ে আবার সোফায় গিয়ে বসলো। আমি বললাম, ভয় পেলে, কেউ তো নেই, কীসের ভয়?

– ভয় নয়, ভালোবাসা।

– বেশ এমনি করে ভালোবাসতে হয় শিখে নিলাম। কাজে লাগাবো।

আমার হিরো যে কতভাবে কত ঢঙে আমাকে প্রেম নিবেদন করে লোকে জানলে অবাক হবে। আমি মুচকি হেসে তার মিষ্টি মধুর অত্যাচার সহ্য করে চলি। তাইতো সে অত্যাচার করতে সাহস পায়, দৈহিক অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারি কিন্তু মানসিক অত্যাচার এতটুকুও সহ্য করতে পারি না। কিন্তু আমার হিরো এ কথাটাও কিছুতেই মনে রাখে না। মনে রাখে না আবার কি? সে বুঝতেই পারে না, তার প্রিয়া তার মুখের দিকে তাকিয়ে সব অম্লান বদনে মেনে নেয়।

সেদিন দু'জনে পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম। সারাদিনে শুধু দুপুরে একটু সময় করে নিয়ে দুজনে একটা গাছতলায় বসলাম। হিরো বলে উঠলো, এখানে তোমার কোন ভাসুর ঠাকুর রয়েছে যে তুমি আমা থেকে দূরে গিয়ে বসলে?

– ও তাই নাকি?

– ঠিক আছে তোমাকে আসতে হবে না, আমিই আসছি।

বলেই ও একেবারে আমার কোলে এসে বসে জড়িয়ে ধরলো।

– ও কি অসভ্য ওঠ উঃ।

– এই অসভ্য বলছো কেন?

– এই খোলা জায়গায় কেউ এমন করে? লোকে দেখলে হাসবে না?

– যাও এখন ঠিক করে বসেছি তো? কিছু খাবে?

আমার হিরো এক ঠোঙা বাদাম ও ২টা পোলার আইস্ক্রিম নিয়ে এলো। আইস্ক্রিম দেখে খুব খুশি হলাম। বললাম তুমি কি করে মনের কথা বুঝলে?

– আমি বুঝবো নাতো কে বুঝবে? আমার প্রেয়সীর ভিতর বাহির সব কিছু আমার কাছে স্বচ্ছ। কোথাও ম্লান নয়।

দুজনে বসে বসে বাদাম চিবুচ্ছি আর আলাপ করছি।

এখানে এসেও দেখি আমার হিরো চিন্তামগ্ন, সে ভাবে তার জীবনের কথা। অতীত কীভাবে কেটেছে ভবিষ্যত ভেবে আরও বেশি চিন্তান্বিত। কীভাবে পরবর্তী জীবনকে গড়ে তুলবে। কীভাবে বড় হবে। ভাবছে কেমন করে তার রাধাকে সুখি করবে। এসব কথা ভেবে ভেবে অধৈর্য হয়ে উঠে। রাধা ওর হিরোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হিরো জিজ্ঞেস করে, কি দেখছো?

– নাতো কিছু না।

– সত্যি করে বলো?

– সত্যিই তো বলছি।

– তাহলে আমার মাথায় হাত রেখে বলো।

হিরো হাত ছেড়ে দিয়ে রাধার মুখে কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, পাগল নাকি? রাধা তুমি আমাকে এত ভালোবাসো?

যখন আমার হিরো কিছু করার কোন সুযোগ খুঁজে পেতো না তখন মনে মনে ভাবতো দূর ছাই ডাক্তারিই ছেড়ে দেবো। এত কষ্ট করে এতো মনোবল নিয়ে ডাক্তারি পড়ে আর ডাক্তার হয়ে কিছুই করতে পারবো না। জীবনে কোন উন্নতি করতে পারবে না। তাহলে কি লাভ হলো ডাক্তারি পড়ে, আবার তখনই ভাবে এই জীবনের সঙ্গে যে আরেক জীবন জড়িয়ে আছে। যে তার জীবনের সর্বস্ব দিয়ে তার হিরোকে নৈবেদ্য দিয়ে সুখি করতে ও সার্থক করতে সর্বদা সচেষ্ট। হিরোর সেই মানস প্রতিমাকে কি করে সে বঞ্চিত করবে। কপালে যাই থাকুক না কেন হিরো জানে তার রাধাকে। হিরো মনে মনে ভাবে তার রাধার মনের কথা, দেহের উত্তাপ, বুকের স্পন্দন শুধু সেই জেনেছে।

পেয়েছে ও অনুভব করেছে। অন্য কারও সংস্পর্শে রাধা আসেনি, রাধা একান্তই হিরোর আরাধ্য দেবী। তাকে ছেড়ে থাকা কোন মতেই সম্ভব নয়। হিরো আপ্রাণ চেষ্টা করবে সাফল্যে পৌঁছতে। কিছুদূর এগিয়েও যখন কূলকিনারা পায় না তখন ভয়ানকভাবে মুষড়ে পড়ে। প্রিয়ার মুখটা দেখার জন্য টাঙ্গাইল চলে আসে। তবুও হিরো পিছপা হবে না। চিকিৎসাই তার জীবনে একমাত্র ব্রত। এ ব্রতে অক্লান্ত চেষ্টার ত্রুটি নেই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে দেশের মানুষকে যেমন উদ্বুদ্ধ করতো আমার হিরো। দেশের লোকও তার লেখা পড়ে অনুপ্রেরণা পেতো এবং হিরো অপার তৃপ্তি পেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকে। তখন আমার হিরো একটু একটু করে শিখরের অলিন্দে পা রাখতে শুরু করেছে। আর ভাবছে আমার সফলতায় রাধার মত এত খুশি কেউ আর

হবে না। রাধা তার জীবনে সর্বসুখ নিয়ে আমার জীবনে এসেছে। হিরোর দু'চোখ জুড়ে শুধু উন্নতির ছবি আলোকিত হচ্ছে। কেমন করে সার্থক হবে সে চিন্তায় মশগুল। রাধা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না তার হিরোর কষ্ট, ভাবনা ক্লিষ্ট মন তাকে খুব পীড়া দেয়। রাধা নানাভাবে তার প্রিয়কে সান্ত্বনা দেয়। হিরো তার প্রিয়াকে আলিঙ্গনাবদ্ধভাবে সোফায় বসে ওকে আদর করে বলতে থাকে কেন তোমার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় হলো না।

– কেন আগে হলে কি হতো?

– কি না হতো? তোমার সান্নিধ্য আমাকে কতখানি উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করেছে সেটা তুমি বুঝো না?

– ছাই করেছে। যা হচ্ছে তা তোমার নিজের গুণে হচ্ছে। তোমার অপরিসীম চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে তুমি এগিয়ে যাচ্ছো। সত্যটা আমাকে বলতে দাও।

– না গো না, তোমারও অবদান আছে। আমার রাধা আমার কাছে না থাকলে সরস্বতী এগিয়ে আসতো না।

– তুমি আমাকে এত মর্যাদা দাও, এতো সম্মান করো তাই তোমার এ সব মনে হয়।

– না গো তা নয়। হিরো তার রাধার শীতল বুকে মুখ লুকিয়ে বললো, এমন ছায়ানীড় আমি আর কোথায় পাবো? এখানেইতো আমার যত সুখ, যত শান্তি। কেউ কি এমন নিরাপদ আশ্রয় ছাড়তে চায়? বল রাধা।

রাধাও দু'হাত দিয়ে তার হিরোর মাথা জাপটে ধরে চোখ বুজে সুখ আস্বাদন করতে লাগলো। আর বলল, আমি কল্পনাও করতে পারিনি তোমার সান্নিধ্যে এত সুখ। যদি আগে টের পেতাম তাহলে তোমার রাধা কত আগেই তোমা সংলগ্ন হতো। আমি ভাবতেই পারিনি তুমি এতো ভালোবাসতে পারো ও ভালোবাসা আদায় করে নিতেও পারো।

আমার হিরো কাজের জন্য নিজে আসতে পারে না বলে আমাকেই তার কাছে যেতে হয়। ঢাকা গুলিস্তানে বাড়ি দেখে আমাকে নিয়ে গেলো। আমার পছন্দ ছাড়া তার বাড়ি করা হবে না। শুধু শুধু আমার কেন দুজনের পছন্দেই হবে। আমি আমার স্বামীকে নিয়ে যে বাড়িতে থাকবো সেটা দু'জনের পছন্দেই নিতে হবে হিরোও এ ব্যাপারে একমত। দুজনে বাড়ি পছন্দ করলাম। এবার সাজানোর পালা। আমি কিছুটা ধারণা দিয়ে আসলাম, কেমন করে বাড়ি সাজাবে। এরপরে যখন যাবো তখন দুজনে মিলে পছন্দ মত সাজাবো। আজকাল আমারও কাজ থাকে। তাছাড়া সারাক্ষণ হিরোর কথা ভেবে ভেবেই দিন পার হয়ে যায়। এর মধ্যে মেজদিকে দেখতে লোক এসেছিলো। ওদের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা। ছেলেটি ভারী সুন্দর। কালেক্টরেটরে চাকরি করে। বর্তমানে পোস্টিং বগুড়া জেলায়। ছেলের বাবা-মা এসে দেখে গেছে। ওদের খুব পছন্দ হয়েছে মেজদিকে। পরে ছেলে আসবে তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। ছেলের পছন্দ হলে আর কোন কথা নয় একেবারে ছাতনাতলা। ছেলের বন্ধুরা যেদিন আসবে মেজদি বললো, রাধা তুই কিন্তু তখন ছেলেদের সামনে যাবি না।

– কেন মেজদি আমি যাবো না কেন? তোকে পছন্দ হয়েই গেছে। তবে?

– সে কথা নয়, রমেশ বাবুর জন্য নয়, যদি অন্যকোন বন্ধু-বান্ধব পছন্দ করে তাহলে কি হবে ডাক্তার বাবুর? এ কথা শুনামাত্র ডাক্তারবাবু হার্ট ফেল করবে। যতবড় ডাক্তারই হোক, হার্ট ধরে রাখার তার ক্ষমতা নেই।

– মেজদি ফাজলামো করবি না। এ সমস্ত কিছুই হবে না। তাছাড়া আমি তোর বরের সঙ্গে বিয়ের আগে দেখা করবো না। হোলো তো?

– তুই আমার বর না দেখে থাকতে পারবি কিন্তু ডাক্তার বাবুকে না দেখে একটু সময়েই অস্থির হয়ে উঠিস।

– মেজদি চুপ করবি।

– চুপ করবি কি? আমি তো সবই জানি, বুঝিও তো সবই। আমাকে যখন বলিস মেজদি ম্যানেজ করে নিস, আমি ঢাকা গেলাম। আমি কি বোকা। ঢাকা যাচ্ছো কার কাছে যাচ্ছো কেন যাচ্ছো তা কি তোমার মেজদি কিছুই বুঝে না? আমি ম্যানেজ করে নিয়ে যাচ্ছি, যখন আমি না থাকবো, তখন কে ম্যানেজ করবে শুনি?

– মেজদিরে মা কি কিছু বলে?

– কি আর বলবে, সব বুঝতে পারে, মুখে কিছু বলে না, তবে আমার মনে হয় তোর বর দেখে মার খুব পছন্দ হয়েছে।

– হলেই ভালো।

হিরোকে একদিন বললাম, আমাকে ঢাকেশ্বরী মন্দিরে নিয়ে যাবে? তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার খুব সখ আমার।

– তুমি যেতে চেয়েছো, আর আমি নিবো না, অবশ্যই নিবো।
হিরোর সঙ্গে চলাফেরা ও টেলিফোনের মাধ্যমে কথাবার্তায় কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য প্রফেসর সবাই বুঝতে পেরেছিলো। আমি ঢাকা যাওয়ার জন্য প্রিন্সিপালের নিকট ছুটি চাইতে গেলে ম্যাডাম মিটমিট করে হেসে বললো, এতো ছুটি নিচ্ছ কেন? এমনি করে ছুটি ফুরালে ভবিষ্যতে কি করবে?
আমি লজ্জা পেয়ে গেলাম। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকলাম। আমার মুখ ঢাকতে দেখে হাসনাহেনা আপা বললো, ওমা লজ্জা পাচ্ছে গো, আমাদের কাছে লজ্জা কি? ওদের কথায় আমি আরও বেশি করে লজ্জা পেয়ে দৌড়ে চলে গেলাম। জান হিরো, যতদিন পর্যন্ত আমি তোমার কাছের লোক না হতে পারবো ততদিন আমি এমন করে লজ্জা পাবো এবং কষ্টও পেতে থাকবো। আমি তোমার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশায় বসে আছি। তোমার প্রতিষ্ঠা হওয়া মানেই তো আমার প্রতিষ্ঠিত হওয়া। প্রার্থনা করছি সেই শুভদিন যেন শীঘ্রই আসে।
হিরো ফোন করে জানালো তুমি বাসে করে ঢাকা আসো। আমি তোমাকে স্ট্যান্ড থেকে রিসিভ করে নেবো। আমার ভীষণ অভিমান হলো এ কেমন কথা আমাকে নিতে আসবে না আমি একা যাবো, থাক আমার ঢাকা যাওয়ার দরকার নেই। আমি ফোনও করলাম না গেলামও না, অভিমান করে বসে আছি। সেদিকে তার খেয়ালই ছিলো না। ৫/৬ দিন পর হঠাৎ ফোন করলো কিগো তুমি আসতে চেয়ে আসলে না কেন? শরীর খারাপ হয়নি তো? সেটা হলেও তো আমাকে জানাবে। কিগো কথা বলছো না কেন? আমার রাধা তো এতো নিষ্ঠুর নয় তার নিরবতায় যে হিরো কত কষ্ট পায়, তা কি আমার রাধা বুঝে না, বলেই একটা ফ্লাইং চুমা খেয়ে নিলো। রাধা আরও রেগে গেলো এখন তার এমন ভঙ্গি তোমাকে দেখাতে হবে না আমি মরি আমার জ্বালায়, আর উনি ঢং দেখাতে এসেছেন। তুমি যাও, আমি আর কথা বলবোই না।
– আমার রাধা যদি তার হিরোর সঙ্গে কথা না বলে তাহলে কি তার হিরো বাঁচতে পারে।
রাধা ধমক দিয়ে উঠলো, তোমাকে না বাজে কথা বলতে বারণ করেছি, বল, এমন কথা আর মুখেও আনবে না।
– আমার রাধা যদি আমার পাশে থাকে তবে তো কোন কিছুরই দরকার হয় না। কিন্তু...
– কিন্তু আবার কি? তুমিই তো পাশে নেই। আমি ঢাকা তোমার কাছে যেতে চাইলাম আর তুমি বললে তুমি একা ঢাকা স্ট্যান্ডে এসো। স্ট্যান্ড থেকে তুমি নিয়ে যাবে। এইতো তোমার সহযোগিতার নমুনা। যদি রাধাকে এতই ভালোবাসো তাহলে তোমার রাধাকে একলা আসতে বললে কেন? যাক এখন আর ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু বলার দরকার নেই, আমি যখন পারি তখন যাবো, না পারি না যাবো।
– তুমি পারবে তোমার প্রিয়তমকে মানসিক কষ্ট দিতে? ঠিক আছে তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। আমি আগামীকালই তোমার কাছে চলে যাচ্ছি।
আমি কি করবো? বর্তমানে যেন আমার মনটা কেমন কেমন করে। আমার মনে হয় আমার হিরো যেন আগের মতো নেই। তার পরিবর্তন হচ্ছে, কেন হচ্ছে তাও বুঝতে পারি না। আদৌ পরিবর্তন হচ্ছে কি না তাও বোধগম্য নয়। তার চেয়ে বরং ঢাকাই যাই এবং যেয়ে দেখে আসি আমার হিরোকে। কাছে গেলে সবই বুঝা যাবে। বুঝা নাও যেতে পারে কারণ ওর তো সম্মোহনী শক্তি আছে। কাছে থাকলে উলটাপালটা কথা বলে ভুলিয়ে ভালোবাসার জালে ফেলে আমাকে জয় করে নিবে তখন আমার বলার কিছুই থাকবে না।
দুদিন পর বৃহস্পতিবার দুপুরে এসে হিরো বললো,
– তুমি রেডি তো? চল। আমি বললাম, কোথায়?
– কোথায় আবার তোমার বাড়িতে।
– আমার আবার বাড়ি কোথায়?
– জান না ঈশ্বরের নির্দিষ্ট করা তোমার বাড়ি আমার হৃদয়ের অন্তস্থলে। তুমি না বল, আমি তোমার সাত জন্মের স্বামী ও সাথী, চল চল।

৪

এবার দুজনে গিয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দির দর্শন করলাম। দু'জনেই মন্দিরে না উঠে মন্দিরের সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলাম। পূজো দিয়ে প্রসাদ পেলাম। আমার হিরো আমার পিছনে দাঁড়িয়ে বললো, মন্দিরে যখন দু'জনেই এসেছি, এখনই এখান থেকে মালা বদল করে বাড়ি যাই, বল ভালো হবে না?

– ভালো তো ষোলো আনা কিন্তু তার আগে বিয়ের প্রস্তুতি, মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে না। আর শুধু কি প্রস্তুতি আয়োজন গুরুজনদের আশীর্বাদ লাগবে না?

– সবই তো বুঝি কিন্তু এত এখন পাবো কোথায়?

– এখন যখন পাওয়া যাবে না, তাই না হয় এখন থাক। যখন পাওয়া যাবে তখন হবে।

দুজনে মন্দির দর্শন করে প্রণাম করে ওখান থেকে আস্তে আস্তে চলে এলো। হিরো বললো, রাধা, দেবী দর্শন করে তৃপ্তি পেয়েছ তো?

– হ্যাঁ তৃপ্তি পেয়েছি, তোমাকে সঙ্গে করে এনে আরও আনন্দ পেয়েছি। যা করবো দুজনে মিলে একত্রে করবো। তবে না শান্তি পাবো। সবাই যেন বলতে পারে আমাদের একাত্মা এক প্রাণ মন। কেউ যেন বিভেদ খুঁজে না পায়।

– ঠিক বলেছো, চল এখন যাই।

রাধাকে নিয়ে হিরো অন্যপথে যাচ্ছে দেখে রাধা বলল–

– ওদিকে কোথায় যাচ্ছো?

– তোমার বাড়ি।

– আমার বাড়ি মানে?

– এসোই না, দেখলেই বুঝতে পারবে।

গেট দিয়ে ঢুকতেই রাধার ব্যাগ বাক্স এগিয়ে নেওয়ার জন্য চাকর এসে হাজির।

– ভাবি সাব বান্দা হাজির, বলুন কি করতে হবে?

হিরো বললো, এ কে?

– আমি আপনার গোলাম ইকবাল হোসেন, আপনি ইকবাল বলেই ডাকবেন।

– ও হিরো তুমি ডুবে ডুবে জল খাচ্ছো। বেশ করেছো।

ইকবাল ওদের দুজনকে ঘরে নিয়ে গেলো। ঘরে ঢুকে রাধা চমকে গেলো। এ কোথায় এলাম। এত পরিপাটি করে সাজানো ঘর, ড্রইং রুম, বেড রুম, কিচেন ব্যালকোনিও সব কিছু ইকবাল ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ভাবি সাব আপনার পছন্দ হয়েছে?

– পছন্দ হবে না? তোমরা দুজনে আমার মনের মত করে সাজিয়েছো তারপরেও পছন্দ হবে না?

ইকবাল বললো, আপনারা হাত মুখ ধুয়ে শান্ত হয়ে বসুন। আমি কফি করে আনছি।

– তুমি কি কফি করবে, আমি করছি।

– না না ভাবী সাব আমি ওসব জানি। আপনি খেয়েই দেখুন।

ইকবালের সাংসারিক কাজ কর্ম ও আচার ব্যবহার দেখে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। ওর কথাবার্তা ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো আমি ওর কত কালের পরিচিত ব্যক্তি। একবার দর্শনেই এত বেশি আপন করে নিয়েছে। ঝটিকা বেগে হিরো এসে বললো, তোমরা দুজনে কি এত করছো যে আমার কথা একেবারে ভুলেই গেলে। ওখানে যে একটা মানুষ আছে, তার অস্তিত্ব আছে সেটাও রাধা তুমি ভুলে গেলে।

– ভুলিনি গো ভুলিনি। তুমি সর্বদা এত ব্যস্ত থাকো আমাকে ফোন করার সময়ও পাও না। আমি ফোন করলে ফোন কেটে দিয়ে বলো ব্যস্ত আছি। নতুবা ফোন ধরে বল একটু পরে কল করবে। সারারাত তোমার ফোনের অপেক্ষায় বসে থাকতে থাকতে সে রাতে আর ঘুমই হলো না। রাধা কাঁদতে কাঁদতে ঘুম থেকে উঠে এক আকাশ কালো মেঘের জল চোখে নিয়ে কর্তব্য কাজ সেরে যায়। আমি কোনোদিনও তোমাকে বলতে পারিনি তুমি আমাকে ভুলে গেছো কেমন অবলীলাক্রমে এ কথাটি তুমি বললে।

যে দুই একদিন ঢাকায় আসি তাতে আমার একটুও কষ্ট হয় না। ইকবাল যেভাবে ওর ভাইসাবকে যত্ন করে তাতে আমিও হার মেনে যাবো। এখন এখানে এসে মনে হয় নিজের বাড়িতে আছি, আগে মনে হতো হোটেলে উঠেছি। এখন সত্যি মনে হয় নিজের বাড়ি। আমার হিরোর অভ্যাস দুপুরে খাওয়ার পর দুমিনিট হলেও একটু গড়িয়ে নিবে। আমাকে ডাকবে, ওর কাছে না গেলে নাকি পরিপূর্ণ হবে না। সুখকর ঘুম হবে না। ঘুম হোক আর নাই হোক, দুজনে গলা জড়িয়ে তো শুয়ে থাকতে পারবে। যদি এ সময়ে কোন ঘনিষ্টজনও দেখা করতে আসে ইকবাল তাদের বারণ করে দিবে ভাইসাব ঘুমুচ্ছে, উঠবে না। ঘনিষ্ঠ কোন দুষ্ট বন্ধু বলে, তোমার ভাবী সাব এসেছে কি? শোবার ঘরের দরজা কি বন্ধ? এত প্রশ্ন শুনে ইকবাল রেগে উঠতো। বলতো– এতো সব আমি বলতে পারবো না। বন্ধুরা হেসে হেসে বলতো, তাহলে আমরা অপেক্ষা করি, ঘুম ভাঙলেই না হয় দেখা করবো। ইকবাল খুবই বিরক্ত হয়ে বললো–

আপনারা যখন কিছুতেই ছাড়বেন না, তখন বাধ্য হয়েই আপনাদের কথা বলি। বন্ধুরা ব্যস্ত হয়ে বললো, না না আমরা চলেই যাই, উঠলে আমাদের কথা বলো।

– আচ্ছা তাই করবো। বলে ইকবাল দরজা বন্ধ করে দিলো আর নিজের মনে বকবক করতে লাগলো। ভরদুপুরে মানুষে খেয়ে দেয়ে একটু আরাম করবে, বিশ্রাম নিবে তা না উনাদের উপদ্রব সহ্য করবে। খেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই। ঠাসঠাস করে দরজা আটকানোর শব্দ পেয়ে হিরো চিৎকার করে ডেকে বললো, ইকবাল, ইকবাল কি হয়েছে রে? এতো জোরে জোরে দরজা খুলছিস কেন? কে এসেছেরে? ইকবাল বললো, কিছু হয়নি। আপনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান। আমি তো আছি। কে একজন এসেছিলো। আমি বলে দিয়েছি এখন দেখা হবে না, ভাইসাব ঘুমুচ্ছে। সে চলে গিয়েছে। পরে আসবে বলে গিয়েছে। আপনারা বিশ্রাম নিন। ঘুমিয়ে পড়ুন। ইকবালের ভাব দেখে মনে হচ্ছিলো যদি ভাবি ও ভাইসাব উঠে পড়ে তবে মহাভারত অশুদ্ধ হবে। না জানি কত বড় ক্ষতি হবে। ইকবালের কাজকর্ম ও মালিকের প্রতি সহমর্মিতা দেখে আমি খুবই খুশি হলাম। আমি কবে আসতে পারবো তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাড়ির কাজের লোকের আন্তরিকতা দেখে আমি যথেষ্ট খুশি হয়েছি। আমার হিরোর যত্নাদির জন্য তেমন চিন্তা আমাকে করতে হবে না। আমার হিরো এমন একটা লোক নিজে এক গ্লাস জল পর্যন্ত ভরে খেতে পারে না। সাংসারিক ব্যাপারে সে কিছুই জানে না। সবকিছু তাকে হাতে তুলে দিতে হয়।

আমাদের দেশের প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর পর নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হবে। সেখানেও রাজনৈতিক উত্তাল। রঞ্জনকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছি না। সে মিটিং মিছিলে সব কিছুতে অংশগ্রহণ করবে। দেখতে দেখতে ছেলেটা যেন কেমন বড় হয়ে উঠেছে। কথায় বক্তৃতায় পরিপক্কতার ছোঁয়াচ ফুটে উঠেছে। মোহাম্মদ ভাই একদিন আমাদের টাঙ্গাইলের বাড়িতে বেড়াতে এসে বললো, রঞ্জন কই বাড়ি নেই? ছেলেটা হাতে পায়ে বড় হয়ে গেছে। সেদিন দেখলাম জেলা স্কুলের মাঠে বক্তৃতা দিচ্ছে। আমি চিনতেই পারিনি, আমার সঙ্গে সাইফুল ছিলো। ওকে জিজ্ঞেস করলাম, কে রে ছেলেটা? ভারী সুন্দর বক্তৃতা দিচ্ছে তো, একেবারে আসর কাঁপানো বক্তৃতা। আমি অবাক হয়ে গেলাম! সাইফুল বললো, চিনতে পারেননি, ওতো রঞ্জন দাশ গুপ্ত। নাম শুনে ঠিকই চিনতে পারলাম।

আমি তো রাজনীতির সঙ্গে কোনোদিনও সম্পৃক্ত ছিলাম না। তাই ওর রাজনীতি সম্বন্ধে এত কিছু জানতাম না। ইলেকশনের জন্য অফিস তৈরি করা ব্যানার টানানো, কোথায় কাকে কাকে সেটিং করা যায়। কোন মিটিংএ কে কে বক্তৃতা করবে সেখানে ছাত্রদের সেট করা কিংবা মিছিলে কে কোন এলাকার নেতৃত্ব দিবে সেটা রঞ্জন সেট করতো। ইলেকশনের কাছাকাছি সময়ে রাস্তায় রাস্তায় ছবি ও ব্যানার দিয়ে সজ্জিত করতো। আমরা জানতাম না যে ভাইটা আমার রাজনীতিকে এতো ভালোবাসে। চা খাওয়ার সময় ও দুপুরের খাবার এবং রাতে আমরা ভাইবোনেরা একত্র বসে খেতাম এবং সারাদিনের যে গল্প জমা থাকতো সব খাবার টেবিলে বসে আলাপ করতাম। রঞ্জন বলতো, জান দিদি আমি না আজকাল স্বপ্নও দেখি জাতীয় পর্যায়ে, এরপর দেখবো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। বললাম, এত স্বপ্ন দেখতে হবে না। সামনেই তোমার অনার্স পরীক্ষা। সেটা নিয়ে একটু ব্যস্ত হওতো ভাই।

– কোন এক কথা বললেই পড়াশোনার কথা বল, আমি কি লেখাপড়া করি না। আমার স্বপ্নটার কথা জানতেই চাইলে না।

– থাক কিছু বলবো না।

– বল তোর স্বপ্নের কথা।

– আমি বাসস্ট্যান্ড দিয়ে আসছি। হঠাৎ দেখি ঢাকা থেকে একটা বাস এসে থামলো। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম আমাদের নেতা বাস থেকে নামছে। আমি তাড়াতাড়ি নেতার হাত ধরে বাস থেকে নামালাম আর চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম নেতাকে কেউ নিতে আসছে কি না, কাউকে না দেখে আমি নেতাকে রিক্সা করে আমার বাড়ির দিকে নিয়ে এলাম। আমার বাড়ির কাছে আসতেই নেতা রিকসা থেকে নেমে পড়লো। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নেতা নামলেন কেন?

– বুঝ না টাঙ্গাইলের নেতা লুৎফর রহমান, আমরা তো ওর ওখানেই উঠি।

– আগে যা করেছেন করেছেনই কিন্তু আজ তা হবে না। কেউতো আপনাকে রিসিভ করতে যায়নি। আমি আপনাকে নিয়ে এসেছি আপনি আমার বাসায়ই যাবেন।

– তাহলে আমার একটা শর্ত আছে।
– বলুন, কি শর্ত।
– তুমি আমাকে কোলে করে বিরাট ড্রেনটি পার করে নিয়ে যাবে।
– ঠিক আছে, তাই হবে।
যখন রঞ্জন নেতাকে কোলে করে নিচ্ছে তখন রঞ্জনের পা পিছলে দুজনেই ড্রেনের মধ্যে পড়ে গেলো। আর তখনই রঞ্জনের ঘুম ভেঙে গেলো। স্বপ্ন শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। দুজনেই ড্রেনের মধ্যে পড়ে গেলো। এতো ভালো নয়। আমি কিছু না বলে ঘরে চলে আসলাম। মন খারাপ করে চলে আসাতে রঞ্জন চিন্তায় পড়লো, কি রে দিদি অমন করে চলে গেলি কেন? ধেৎ ছাই ভালো লাগে না। বলে রঞ্জন নিজের ঘরে শুতে গেলো।
আমারও ভালো লাগে না, কলেজে গিয়েও শান্তি পাই না। কেন যেন বারবার মনটা উচাটন হয়ে উঠে। বাপ মরা ছোট ভাই ওকেই যদি মানুষ করতে না পারি তবে বাবার ফেলে রাখা কোন কাজই তো করতে পারবো না। মাঝে মাঝে ছেলেটার কথা চিন্তা করতে করতে রাতে ঠিকমত ঘুমও আসে না। ঘুম না এলে যখন বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকি তখন মেজদি ধাক্কা দিয়ে বলে, চুপ করে শুয়ে থাক। মেজদি বলে উঠে, মাকে বলবো নাকি, তার ছোট মেয়ের কীর্তিকাহিনি। তা হলেই তো সুরাহা করে দিতে পারে।
মেজদি যা বলে বলুক আমি ওর কথা গায় না লাগিয়ে চুপটি করে বালিশে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকি। শুয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি তা নিজেই জানি না। যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলাম রঞ্জন বিছানায় নেই, বাসায় আসে অসময়ে, খাওয়া দাওয়ারও কোন সময় মানে না। হয়তো বা কোনোদিন সারাদিন পর সন্ধ্যা বেলায় বাড়ি এসে ভাত খেলো। এতে আমরা বোনেরা যথেষ্ট দুঃখ পাই। মা তো নিজের দুঃখের জ্বালা দূর করতে আমাদের বকতে থাকে। কি করবো আমি? কম তো চেষ্টা করিনি ওকে পথে আনতো কিন্তু আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। আমি রঞ্জনকে বুঝিয়ে সুজিয়ে ও বকে বকেও কিছুই করতে পারিনি। কি করবো ভেবে না পেয়ে আমার হিরোকে সব কথা বললাম। হিরো চিঠি লিখে জানালো রঞ্জনকে সুপথে চালিত করতে একমাত্র তোমরা ওর দিদিরাই পারবে। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ভাবলাম অন্য বাড়ির ছেলে কেন ভার নিবে। বরং এ বিষয়ে তার এত অবহেলা। এদিকে আমি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা নিয়ে বসে আছি। তখন আমি বুঝতে পারিনি, হিরো নিজে ব্যস্ত মানুষ। তাকেই দেখার লোক নেই, উপরন্তু উটকো ঝামেলা কে নেয়। আস্তে আস্তে আমিও বুঝতে পারলাম সে তো ঢাকা বেশি থাকে, বেশির ভাগ সময়ই তাকে চিকিৎসার কাজে ঢাকার বাইরে এবং দেশের বাইরেও কাজ করতে হয়। আমি অযথা লোকটার উপর রাগ করি। তার চিন্তার দুটো দিক। এক. রাধা, দুই. কাজের উন্নতি, কোনটাই হিরো ছোট করে দেখতে পারে না, সর্বদা একই চিন্তা।
যে দিনগুলো হিরোর মন্দ যাচ্ছিলো তখন ওর মুখের দিকে তাকানো যেতো না। আমার কাছে এসে খুব মন খারাপ করে বলতো, রাধা বিধাতা কি আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাবে না? আমি কিছুই করতে পারছি না। তোমাকে আমার কাছে নিয়ে কষ্ট দিতে পারবো না।
রাধা ওর মুখ চেপে ধরে বলল, আমি কি তোমাকে অগাধ সম্পদের মালিক হতে বলেছি, তা না হলে তোমার ঘরে যাবো না।
– নাই বা বললে, আমি তো তোমাকে কোন মতেই কষ্ট দিতে পারি না, তোমাকে কষ্ট দেওয়ার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।
এবার হিরোর হাত চেপে ধরে রাধা কেঁদেই ফেললো। বলল, আবার যদি এমন কথা বল, তবে তোমার সঙ্গে আমি সম্পর্কই রাখবো না।
– এটাও কি সম্ভব? তুমি এটা কি বললে? আমাদের ভালোবাসা কি এতই ঠুনকো?
– এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, এমন কথা বললে কেমন লাগে?
– হ্যাঁগো বুঝেছি, তবুও পরিস্থিতির চাপে পড়ে মুখ দিয়ে এমন অলুক্ষণে কথা বের হয়। রাধার গা ঘেঁষে বসে দুটো হাত ধরে বলল, হে রাধে ক্ষমিও মোরে। রাধা হিরোর দুহাত ধরে হেসে দিয়ে বলল, চুপ কর। হিরো সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো না।
রাধার গালে গাল ঠেকিয়ে বসে রইলো।
– এই না তোমার কত দুঃখ, এখন সেগুলো কোথায় গেলো?
– আমার রাধা আমার সাথে থাকলে কোন দুঃখই আমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

– তোমার রাধাতো তোমাকে বলেনি তোমার বেতন পাঁচ লাখ না হলে চলবে না। সংসার হবে আমার, আমি যেভাবে পারি চালিয়ে নিবোই। তাছাড়া অভিযোগ না থাকলেই তো হলো।
– এখন এ কথা বলছো। যখন ছেলে-মেয়েদের সুখের জন্য অনেক টাকা পয়সা দরকার হবে তখন? ওদের দুঃখ দেখে তখন কি মুখ ঝামটা দেবে না?
– কখন কি হবে না হবে সেটা ভেবে এখনই না খেয়ে থাকা শুরু করি। যখন যা হবে তখন দেখা যাবে। তাই বলে সুখ বিসর্জন দিয়ে মুখ কালো করে বসে থাকবো?
আমি হিরোর কাছে এসে ওকে জাপটে ধরে বললাম,
– কি খাবে বলতো?
– সূর্য অস্ত যাচ্ছে। রক্তিম আভা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঠের উপর ছায়া লম্বালম্বি হয়ে পড়েছে। এখন কি খাওয়া যায় তুমিই বল।
– রাস্তার উল্টো দিকে চলো ঐ খুপড়িতে বসে চা পান করি, কি বলো?
– চলো তাই যাই। এটাই তো চা পানের উপযুক্ত সময়।
– আমি আবার বললাম ডাক্তার সাব কি রাস্তার খুপড়ি ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চা পান করবে?
– তুমি যেমন আমার শুধু রাধা আর কিছু নয়, তেমনি আমি তোমার হিরো ডাক্তার সাবও নই। অন্য কিছুই নই। আমরা এই বলে দু'জনের কাছে দু'জনে পরিচিত হবো। দু'জনে চা পান করে এসে ঐদিন আমি সন্ধ্যার দিকে বাসে উঠে টাঙ্গাইল রওনা হলাম। মনটা আমার একটুও ভালো লাগছিলো না। হিরো আমাকে বাসে তুলে দিয়ে বললো, তুমি চিন্তা করো না। আমি শীঘ্রই টাঙ্গাইল আসছি। মিষ্টি ভাষায় বিদায় নিলো হিরো।
হিরোর যে এতটুকুও অবসর নেই, একথাটা একবারও আমাকে বুঝতে দেয়নি। সে যে ব্যস্ত সেটা আমি বুঝতে পারি কিন্তু এতটা যে ব্যস্ত তা বুঝতে পারিনি। আমার হিরো যে একটু একটু করে ধাপে ধাপে উপরে উঠছে সেটা বুঝতেও আমার কষ্ট হয়নি। এত কষ্ট সহিষ্ণু লোকটা নিজের যত্ন নেই, ঠিকমত খাওয়া নেই এক লক্ষ্য নিয়ে তার পিছনে ছুটছে তো ছুটছেই। আমি বলেছিলাম ঠিক আছে, পরিশ্রম কর উন্নতির দিকে ছুটে যাও কিন্তু তার আগে তোমাকে নিজের প্রতি খেয়াল ও যত্নবান হতে হবে। হেসে দিয়ে আমার হিরো বললো, কি বললে? ওগুলো তো তুমিই করছো। আমার রাধার যত্ন ছাড়া তার হিরো কি কখনও বাঁচতে পারে? আমার রাধার খেয়াল রাখা ছাড়া কি তার প্রিয়তমের উন্নতি হতে পারে? রাধা ছাড়া এর কিছুই সম্ভব নয়। আমার রাধা তুমি যুগ যুগ জিয়ো, তুমি দীর্ঘজীবী হও। রাধা হাসতে হাসতে বলল, দেখো তোমার শরীরটা কত খারাপ হয়েছে, শুধু কাজ করেই যাচ্ছো তার প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে সেদিকে কোন দৃষ্টিই তুমি দাও না। তুমি যদি আমার কথা না শোন এবং এভাবেই যদি চলতে থাকো তাহলে কিন্তু ভালো হবে না। আমিও কিন্তু তোমার শরীরের কোন যত্ন নিবো না। তোমার শরীরকে কষ্ট দিবো, তখন বুঝবে কেমন মজা।
– নাগো, তুমি এমন নির্দয় হইও না। আমি তোমার সব কথা মেনে চলবো।
– মনে থাকে যেন।
আমরা সকালের নাস্তাও সবাই এক সঙ্গে করি। আমার এক ভাই বিমল স্থানীয় একটা কলেজে শিক্ষকতা করে। দুই ভাই রঞ্জন ও বিমল একই সঙ্গে খেতে বসেছে। ওদের ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে দুই ভাতিজা অংশুমান ও অনির্বাণ। আমি ওদের খাবার দিয়ে বড় ভাতিজা অংশুমানের হাত ধরে আমার ঘরে এনে জিজ্ঞেস করছিলাম, আজকের ক্লাসের পড়া কি শেখা হয়েছে? এতকথা মা শুনতে পেয়ে ধমকের সুরে বললো, সারাজীবন ভর শুধু তদারকিই করতে থাক, রান্নাঘর থেকে খেয়ে এলি না কেন? আর ও দুটোকেও খাওয়ালি না কেন। ওদের খাওয়াতে খাওয়াতে আর নিজের খাবার সময়ই পাবে না। বেশি বললে বলবে মা চিন্তা করো না আমি ক্যান্টিন থেকে ঠিকই খেয়ে নিবো। এইতো আমার কপাল।
– হ্যাঁ মা তুমি চিন্তা করো না।
প্রতিদিন সবাইকে খাওয়াতে খাওয়াতে আমার দেরী হয়ে যেতো। এমনি করেই আমাদের দিন চলে যাচ্ছিলো। ভালোই যাচ্ছিলো, রঞ্জনটা রাজনীতি করে একটা জটিল অবস্থায় আমাদের ফেলে দিলো। কিছুতেই মানতে পারছিলাম না। সকালে নাস্তা খেয়ে রঞ্জন দলের ও প্রার্থীর প্রতীক নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে সুন্দর করে লাগিয়েছে। আরও দু'এক জায়গায় প্রতীক লাগিয়েছে এবং বাসস্ট্যান্ডে অফিস রুম সুন্দর করে সাজিয়েছে। ওখান

থেকে এসে ভাত খেয়ে বের হয়ে গেছে। শুনলাম পাড়ায় জায়গা জমি নিয়ে দু'পরিবারের ঝামেলা হচ্ছিলো সেটা মিটমাট করে দিয়েছে। আমি কলেজ থেকে এসে খেয়ে ঘরে বসেছি। প্রতিবেশী এক রাজনৈতিক মহিলাকর্মী মিনু আনাহোলি এসে বললো, দিদি রঞ্জন কই? বললাম, ওতো বাসায় নেই।

– কোথায় গেছে তা কি জানেন?

– না, আমি তো এই মাত্র কলেজ থেকে এলাম।

– শুনলাম রঞ্জনকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

এ কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম! সজোরে চিৎকার করে বললাম,

– এ কি বলছো তুমি? খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, মানে কি?

তখন আর কোন চেতনা ছিলো না, ভাইয়ের জন্য কেমন যে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। আমার মনটা যেন কেমন কোঁকাচ্ছিল। সেদিন ওর যুগনী হাটে যাওয়ার কথা ছিলো না কিন্তু দলের নেতা বলল, রঞ্জন যাবে তুমি আমাদের সঙ্গে? সেতো বক্তৃতা দিতে পারলে খুব খুশি। নেতা বলল, যুগনীতে বক্তার অভাব তোমার গ্রুপ নিয়ে চলো। রঞ্জন লম্বায় ছ'ফুট ছিলো। ওরা হেঁটে হেঁটে যুগনী গিয়েছিলো। রঞ্জন এক বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়ে বলছিলো রাজনীতি করলে কোন লাভ নেই, আমরা কোনদিনও নেতা হতে পারবো না, বর্তমান নেতারা মরলে তো নেতা হবো। তাছাড়া নেতা হওয়ার কোন পথ দেখি না। ভাইটির খুব সখ ছিলো বড় নেতা হবার। সেই কোন সকালে চা খাওয়ার সময় রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারপরে তো কলেজে চলে গিয়েছি।

ভাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এ সংবাদ শুনে মা দৌড়ে গেলো পাশের বাসার নেতার কাছে। যেতেই সিঁড়ি থেকে পড়ে মায়ের পা মচকে গেলো। নেতা বাড়ি নেই, তাই দেখা হয়নি। এ সংবাদ শুনে আমি উদ্ভ্রান্তের ন্যায় বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তা দিয়ে দৌড়িয়ে যখন মেইন রোডে উঠেছি তখন শ্যামলদা এসে আমাকে ধরে বললো, দিদি কোথায় যাচ্ছো? আমি কেঁদে বললাম,

– কোথায় আর যাবো, তোমরা শোননি রঞ্জনকে পাওয়া যাচ্ছে না?

– তুমি বাসায় যাও, কোথায় যাবে, পাওয়া তো যাবেই।

– পাওয়া যাবে?

– হ্যাঁ, যাবে।

আরও চার পাঁচ জন ছেলে এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালো মলিন মুখে। শ্যামলদা বলল, নান্টু দিদিকে নিয়ে যা বাড়িতে আমরা যাই রঞ্জনকে খুঁজে আনি।

তবুও আমার মন শান্ত হচ্ছে না। একি ছোট মানুষ যে হাটে বাপের হাতে থেকে ছুটে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। ওরা জোর করে ধরে আমাকে বাড়ি নিয়ে এলো। বাড়ি এসে দেখি উঠোনে লোকে লোকারণ্য, লোক দেখে আমার মনে সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো। আমি চিৎকার দিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে বললাম, ভাই তুই এ কি করলি রে। তোর কি হলো রে কাঁদতে কাঁদতে মেজদির চিৎকার শুনে ঘরে গেলাম। বললাম, মেজদি চলতো, একলা একলা আমার ছোট ভাইটা কি করছে। ওর কাছে তো কেউ নেই, কেউ তো একটু আদরও করেনি, সান্ত্বনার কথাও বলতে পারেনি। নিজের কষ্টের কথাও কাউকে জানাতে পারেনি। মেজদি চল ভাইটার কাছে যাই। দু'বোনে ঘর থেকে বের হতে যাচ্ছে অন্য লোক আমাদের থামিয়ে দিয়ে বললো, কোথায় যাচ্ছো তোমরা? কোথায় সে কিছুই তো জানি না এখন রঞ্জন তোমাদের কেউ না, সে এখন সরকারের লোক অনেক প্রোটোকল তার উপর আরোপিত হবে। আমরা চিৎকার করতে করতে বললাম, আমার ভাই, সম্পত্তি আমার বেঁচে থাকলে প্রোটোকলের কোন দরকার ছিলো না, এখন কোন দরকার আমরা মানি না। ও ভাইরে তুই কেন ওখানে মরতে গেলি। তোকে রাজনীতি করতে কত নিষেধ করেছি। এমন একটা ভাই আমি কোথায় গেলে পাবো?

সারারাত ভরে আমরা অঝোর ধারে কেঁদেই চললাম, সবাই বলল, তোমরা যদি এমন করে কাঁদো তাহলে তোমার মাকে কে সান্ত্বনা দিবে? মায়ের কাছে যাও, তার বুকটা ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা কর। ভাবলাম তাইতো, মায়ের জ্বালা তো কম নয়, তার তো কোল ঝরা সর্ব কনিষ্ঠ ছেলেটি। বিমল কলেজে ছিলো, সে শুনতে পায়নি, তাকে পাড়ার ছেলেরা গাড়ি দিয়ে নিয়ে এলো। বিমল ভেবেছে রঞ্জন হয়তো আহত হয়েছে। হাসপাতালের সামনের রাস্তা দিয়ে যখন আসলো তখন ওখানে এসে কিছু না বলে গাড়ি বাসায় নিয়ে এলো। বাসায় ঢুকে অনেক লোকের সমাগম দেখে বিমল কেমন করে যেন বুঝতে পারে। তাই গেটে ঢোকার পরই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাকে ধরাধরি করে বাড়ির ভিতরে

নিয়ে ঘরে তুলে। আমাদের ভাগ্যে যে এমনটি হবে তা কোনোদিনও ভাবিনি।

রঞ্জনের মৃত্যুর পর মায়ের উপর খুব খেয়াল রাখতে হতো, মা যেন কেমন আবোল তাবোল বলতো। নিজের উপরও খুব বৈরাগ্য এসে গিয়েছিলো। আমি মায়ের দিকে নজর রাখলাম। আমার মন এত খারপ দেখে আমার হিরো টাঙ্গাইল এসে কয়েক দিন থাকলো। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, রাধা সামনের রমযানের ছুটি এক মাসের মত হবে চলো আমরা বেড়াতে যাই।

– তোমার তো ছুটি নেই।

– নাই থাকুক, তোমার এত বড় বিপর্যয়ের দিনে আমি ছুটির আশায় থাকবো? ছুটি না দিলেও আমি তোমার জন্য ছুটি নিয়ে যাবো। মানুষের জীবনে যেমন দুঃখ কষ্ট আছে তেমন তার উপশমও আছে। তাই বলে মানুষের মঙ্গল করবো না? ছুটি না দিলেও চলে যাবো। আমার রাধার কষ্ট আমি সইতে পারি না। সময় করে তুমি একদিন ঢাকায় এসো। ভিসা করে টিকিট করে ওখান থেকেই রওনা দিবো।

– বেশি দিন থাকা যাবে না। মাকে মেজদি একা সামলাতে পারবে না।

বারবারই মেজদি ম্যানেজ করে নেয়, এবারও মাকে সত্য মিথ্যা বলে ছোট বোনকে পাঠিয়ে দিলো প্রেমরাজ্যে প্রেমিকের সাথে। ওখানে গিয়ে আমরা আগ্রাগ্রান্ড হোটেলে উঠেছিলাম। তারপর তাজমহল, হনুমানজির মন্দির। তারপর দিল্লীর ত্রিমূর্তি, মহাশ্মশান, দিল্লীগেট, ফিরোজশাহী কোটলা, আজমীর শরীফ, কুতুবমিনার ইত্যাদি ঘুরিয়ে দেখালো। আবার বললো, রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জবনে যাবে না দর্শন করতে? এতো কাছে এসে যদি মথুরা ও বৃন্দাবন না যাই। তবে আমার রাধার মন খারাপ হবে না?

– তা নয়, তুমি আমার সাথে থাকলে আমি পূর্ণ মনোবল নিয়ে থাকি। তোমার অদর্শনে আমি যেন কেমন প্রাণহীন হয়ে পড়ি। প্রতিবারই তুমি এসো তোমার সম্মোহনী গুণে আমার প্রাণ সঞ্চার করে দাও। এটা কি আমার জীবনে কম পাওয়া? জান তুমি যদি আমাকে এখানে না আনতে তাহলে এত সহজে আমি স্বাভাবিক হতে পারতাম না। তোমারই অপরিসীম গুণে তোমার প্রিয়তমা হতে পেরেছি। দিল্লীতে আমরা দুজনে ১০ দিন ছিলাম। দেশে ফেরার পথে আমরা দার্জিলিং হয়ে এসেছি। প্রেমের মন্দির তাজমহল দেখে একটুও তৃপ্তি পাইনি, যা দেখবো সে গেটই তো বন্ধ। দার্জিলিং এসে বাংলার অনেক পরিচিত মুখ দেখলাম। তাছাড়া গ্রীষ্মকালে সত্যিই ঠিক আরামদায়ক আবহাওয়া। এখানে পাঁচ দিন থেকে তারপর বাড়ি চলে আসি। অন্য কারো সাথে গেলে হয়তো এতো আনন্দ পেতাম না। আমার হিরো যে যত্ন সহকারে সমস্তটা ভ্রমণ আরামদায়ক ও আনন্দময় করে দিয়েছিলো, এমনি আমার জীবনে কোনোদিনও হয়নি।

বাড়িতে ফিরে এসে দেখলাম মাও কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে আসছে । মা জিজ্ঞেস করলো ওখানে তোর ভালো লেগেছে? তোর ওখানে বড়দির আত্মীয় গিয়েছিলো?

– না গো মা ইন্ডিয়া একটা বিরাট দেশ। আমাদের দেশের মতো ওদের ২৬টি দেশ। কাজেই এক রাজ্যের থেকে আরেক রাজ্যে যাওয়া অনেক পথ, আমরা পশ্চিমবঙ্গে এসে দার্জিলিং ঘুরে ঢাকা এসে পৌঁছেছি, মা আমরা বৃন্দাবন দেখেছি, মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখেছি। তুমি যাবে মা বৃন্দাবন দর্শন করতে?

– কে আমাকে নিয়ে যাবে?

– কে আবার নিয়ে যাবে, তোমার মেয়েরা আছে না, তারাই তোমাকে নিয়ে যাবে।

মা খুশি হয়ে বললো, তাহলে তো আমার আপত্তি নেই। আমার আদরের ছোট ভাইটি মরে যাওয়ার পর মাকে এই প্রথম দেখলাম, মা অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। মাকে বললাম, আমি আর মেজদি তোমাকে তীর্থদর্শন করিয়ে আনবো। আমার মাকে খুশি করতে না পারলে যে আমার স্বর্গদর্শন হবে না। আমি মায়ের অতি নিকটে গিয়ে দেখি, মায়ের চুলগুলো প্রায় জট হয়ে রয়েছে, এইতো তোমার শরীরের যত্ন নেওয়া। এমনি করে থাকলে নানা রোগে ভুগে মরেই যাবে। আমি বাড়ি নেই, মেজদি হয়তো সময় পায়নি, তাই তুমি এমন অযত্ন করবে?

দিল্লী থেকে বাড়িতে এসে ঘরে ঢুকেই দেখি রঞ্জনের ছবিটা জ্বলজ্বল করছে। ওকে দেখেই মনটা যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠলো। কি করবো। যার সঙ্গে আমার এতো নিবিড় সম্পর্ক তাকে কি এতো সহজে ভোলা যায়। যেমন মাও কোনোদিন পারবে না। আমরা ভাইবোনেরাও পারবো না।

সারাজীবন স্নেহের ভাইটি হৃদয়ের মণিকোঠায় জাগ্রত হয়ে থাকবেই। আমি বাড়ি ফিরে আবার কলেজের কাজে মনোনিবেশ করি। আমার হিরো একদিন হঠাৎ করে ক্লাসের সময় ফোন করলো। আমি ক্লাস থেকে বের হয়ে নীলাঞ্জনার কাছে আমার ফোন রেখে আবার ক্লাসে ঢুকলাম। তারপর ক্লাশ শেষ করে যখন কমনরুমে আসলাম নীলাঞ্জনা ফোনটা আমার হাতে দিয়ে বললো, কোন দুঃখে যে তোমার ফোন হাতে নিয়েছিলাম। লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম কি অবস্থা কি অবস্থা। সশব্দে ফোনেই যেভাবে চুমা খাচ্ছিলো কাছে পেলে না জানি কী করতো।
পতিনিন্দা সতীসাধ্বী স্ত্রীরা কোনোদিনও সহ্য করতে পারে না। তাই বললাম, চুপ করো দেখা যাবে ভবিষ্যতে কে কি করো আর না করো।
– তাই বলে বউকে ছেড়ে অন্য মেয়েকে চুমু খাবে?
– তুমি পরিচয় দিলেই পারতে তাহলে এমনটা হতো না।
– পরিচয় দেওয়ার সময়টুকু দিলো না, তার মনের ভাব প্রকাশ করে ফেললো। বুঝতে না পেরে আমি ফোন বন্ধ করে দিলাম।
– এই বন্ধটা আগে করলেই ঝামেলা হতো না। শুধু শুধু আমার হিরোকে দোষারোপ করছো।
আমি যখন চুপিসারে হিরোর কানে কানে কোনো কথা বলতে যাই তখন হিরো দু'হাত দিয়ে মাথাটা ঘুরিয়ে সামনে এনে গোলাপের গন্ধ নিয়ে তৃপ্তি পেতে চায়। আমার গোলাপের গন্ধে আমি মাতোয়ারা আমি অভিমান করে বলি, আমি গোলাপ নইগো অত সুন্দর নই আমি কাজল রেখা।
– তুমি যেটাই হও, আমার সত্যিকারের রাধা। রাধার ছোঁয়াচ পেলেই আমার শান্তি। আমাকে সামনে বসায়ে দু'হাত দিয়ে ধরে মাথাটা কাঁধে রেখে আদর করতে লাগলো। আমি গোলাপ নই কিংবা কাজল রেখা নই। তার আদরের কাছে সব তুচ্ছ। হিরোর আদর সোহাগ খেতে খেতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, ভুলে যাই আমার অতীত ও ভবিষ্যত। দুজনে কে কাকে আগে ভালোবেসেছি, এটা নিয়ে আমাদের দু'জনের মধ্যে প্রায়ই তর্কাতর্কি হতো। এ তর্কে আমি কোনোদিনও জিততে পারিনি। হিরো বলতো সে নাকি প্রথম দেখাতেই আমার চোখের মায়াবী চাহনি দেখে দারুণভাবে আমাকে ভালোবেসেছে। আর আমার এমন আকর্ষণীয় দৃষ্টিতে ভালোবেসে ফেলেছে। ওর কাছে আমার যুক্তি টিকতে পারেনি। হিরো বলে সে ঘুমের মধ্যে আমাকে ভালোবাসে, স্বপ্নেও প্রচুর ভালোবাসে, জেগে জেগে আমাকে সুখী দেখে আমিও ছাড় দিতে রাজী নই। তুমি ভালোবাসো, ভালোবাসো বলেই তো আমিও তোমাকে নিবিড়ভাবে এতো ভালোবাসতে পারি, সে তোমারই ভালোবাসার জোরে, নইলে আর পাবো কোথা। দুজনের ভালোবাসা মিলে হয়েছে দারুণ প্রেমের সংসার। সারাজীবন যেন আমরা এভাবেই থাকতে পারি।
রঞ্জনকে আমরা হারিয়েছি। আমাদের পরিবারটা শোকে দুঃখে একদম মুষড়ে পড়েছে। আমরা প্রতিদিনই ওকে স্বপ্ন দেখি নানারূপে। স্বপ্নের কথা মনে হলেই বারান্দায় বসে বসে কান্না শুরু করি, কান্নার সুর শুনে মা ঘর থেকে বের হয়ে বলে, যে এতো কষ্ট দিয়ে সবাইকে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলো। কেন তার কথা এতো ভাবিস? কখনো কি সে আমাদের কথা ভেবেছে? সবার এতো আদর যত্নে যাকে মানুষ করা হলো সেই নিমকহারাম ছেলে কতই না কষ্ট দিলো। শোক ব্যথা, পরম আত্মীয়দের মৃত্যু কখনও ভোলা যায় না। কারো কাছে আমার ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনাটি জানতে চাই না।
সত্যি ঘটনা জানতে ভয় পাই, মৃত্যুর সময় ভাইটা না জানি কত আমাদের ডেকেছে, প্রিয়জনদের দেখতে চেয়েছে। এ কথা মনে হলেই বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়, চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় জল বয়ে যায়। কিন্তু মায়ের মুখটা মনে হলেই আর কাঁদতে পারি না, না পারি কাঁদতে না পারি কান্না বন্ধ করতে। ভিতরে ভিতরে কান্না চাপা পড়ে ফাঁপর ফাঁপর লাগে। সেটা সহ্য করা আরও কষ্টসাধ্য, মা আমার কাছে এসে আমার মাথা পিঠ হাতিয়ে দিয়ে বললো, মারে আর কাঁদিস না, কি হবে কেঁদে, সেতো আর ফিরে আসবে না। একথা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে চলে গেলো।
রঞ্জনের প্রিয় বন্ধু সালাম সেদিন ওর সঙ্গে মিছিলে গিয়েছিলো। আমার ভাই লম্বায় ও চেহারায় ভারী সুন্দর ছিলো, সে সর্বদা মিছিলের সামনে দাঁড়াতো। সালামের কাছে আদ্যোপান্ত সব কাহিনি শুনলাম, একবার শান্তিপূর্ণ মিছিল করে এসে ওরা মিটিং করে। ঐ হাটে রঞ্জন সুন্দর বক্তৃতা দেয়। প্রতিপক্ষের লোকদের হাবভাব ওদের ভালো লাগেনি, পরিবেশ ভালো লাগেনি। ওরা নেতাকে বলল, চলুন আমরা টাঙ্গাইল চলে যাই, নেতা বললো, কে বলে হাটের পরিবেশ ভালো নয়; যাও তোমরা আর

একবার মিছিল নিয়ে ঘুরে এসো। নেতার কথা অকপটে পালন করাই তো রাজনীতির নিয়ম। ওরা শ্লোগান দিয়ে মিছিল নিয়ে হাঁটের ভিতরে যেতেই সেখানে অবস্থান নিয়েছিলো দুর্বৃত্তরা। রঞ্জনরা জানতো না যে ওরা এমনভাবে আক্রমণ করবে। দৌড়ে এসে বলিষ্ঠ যুবক রঞ্জনের বুকে এমনভাবে ছুরিকাঘাত করলো যে এক আঘাতেই সে ওখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলো। তাকে আর হাসপাতালেও নেওয়া গেলো না। সে স্পট ডেথ হলো। এ পর্যন্ত শুনেই আমরা চিৎকার করে উঠে আহাজারি করতে লাগলাম। হায়রে আমাদের ভাগ্য।

মায়ের দুঃখ-কষ্ট যা মেনে নিয়ে আমাদেরও মেনে নিতে বলেছে। মা ভাবছে এতো সমস্ত দুঃখ নিয়ে শোকাকিভূত থাকলেতো আর সংসার চলবে না, তাই শোক সংবরণ করে সংসারে চলতে হবে।

মেজদির বিয়ে এতো দিনে হয়ে যেতো কিন্তু এই দুর্ঘটনার জন্য বিয়েটা থেমে গেলো। আমাদের ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনদের ডেকে মেজদির বিয়ের আলাপ করা হলো। মামা ও কাকারা বিয়ের কথা উত্থাপন করতেও সাহস পায়নি। ছোট মামা বললো, দিদি তুমি যে সংসারের ভালো মন্দ চিন্তা করে বিয়ের প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছো তাতে আমরা সবাই খুশি হয়েছি। তুমি সত্যই কর্তব্যপরায়ণ মা, কোন ঘটনাই সংসারকে পিছে ফেলে রাখতে পারে না সময় তার আপন গতিতে চলবেই। তাহলে দিদি তুমি বলো, আমাদের কি কি করতে হবে। আমরা সেভাবেই এগুবো। মা বলল- ছেলের বাবা-মার অন্নপূর্ণাকে দেখে পছন্দ হয়েছে এবার ছেলে আসুক, তারা দেখুক তাদের পছন্দ হলে আমরা দেখবো, দুপক্ষের পছন্দ হলেই তো বিয়ে। তখন আমরা কথাবার্তা বলে দিন তারিখ ঠিক করবো, মেয়েকে কোথায় পাঠাচ্ছো বাড়িঘর, পরিবেশ এসবতো অবশ্যই দেখতে হবে।

মায়ের ইচ্ছা সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সেরে যেন তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারে তার আর কিছু ভালো লাগে না। ছেলে বিমল, ওর শ্বশুর একজন প্রতিবেশী, দুই কাকা ও দুই মামাকে ময়মনসিংহে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। সকালে ওরা রওনা হয়ে সন্ধ্যার দিকে ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইল ফিরে এলো। এসে নতুন জামাইবাড়ির সবার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, মা প্রশংসা শুনে খুবই খুশি হলো, তবুও বললো, বাবা মায়ের তো আগেই পছন্দ হয়েছিলো। সেদিকে ঠিকই আছে। এবার বরের পছন্দ হওয়া এবং অন্নপূর্ণার পছন্দের মত নিতে হবে, তোমরা কি বল?

সবাই বলল, ঠিকই বলেছো তুমি, ওরা আসুক দুজনের কথা হোক, দেখা হোক তারপর সব জেনে বুঝে আমরা ব্যবস্থা নেবো।

আমার মনে হচ্ছে এ বিয়েটা অতিসত্বর হয়ে যাবে। কারণ আমার মেজদি সত্যিই খুব সুন্দর। মেজদি মায়ের চেহারা ও গায়ের রঙ পেয়েছে। আর আমার গায়ের রঙ বাবার মতো কালো।

একদিন মেজদির হবু বর ও তার চারজন বন্ধু নিয়ে আমাদের টাঙ্গাইলের বাড়িতে এলো। পাঁচজন এসেছে সবাই অপূর্ব সুন্দর আমি ওদের রূপ দেখে মুগ্ধ হলাম। মেজদিকে বললাম, মেজদি এটা কেমন করে হলোরে? ভগবান এই লোকগুলোকেই সব রূপ ঢেলে দিয়েছে।

মেজদি বলল, তোকে আগেই বলেছি ওখানে যাবি না। এদের মধ্যে কেউ যদি তোকে পছন্দ করে তবে কি হবে ডাক্তার বাবুর।

– ওরা যে সুন্দর ওরা কি আমার মত কুৎসিত মেয়েকে পছন্দ করবে।

– কে বলল পছন্দ করবে না? সুদর্শন ডাক্তারবাবু কি তোমাকে পছন্দ করেনি?

– সে কথা বাদ দাও। ডাক্তারবাবু আমার সাতজন্মের স্বামী। আমাদের বাড়িটা আবার পূর্বের মত প্রাণ ফিরে পেয়েছে। বিয়ের নানা কাজের ধুম, হৈচৈ পড়ে গেছে। দূরদূরান্ত থেকে আমার স্বজনরা বিয়ে বাড়িতে আসছে। তাদের আগমনে বাড়িটা সরগরম হয়ে উঠেছে। এ ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হওয়াতে মেজদিও খুব খুশি। মেজদি আমাকে বললো, ছোট জামাইকে নিমন্ত্রণ করবি না?

– আমি কেন করবো? তোমাদের জামাই তোমরা করো।

– তাতো ঠিকই, আমিই করবো, একসঙ্গে বাজার করলে ভালোই হতো। বারবার বাজারে যাওয়াও মুশকিল।

– বাজার করা মুশকিল কীসের? বিয়েতে খুবই ঝক্কি, পরিশ্রম একটু কমলে রেস্ট নিয়ে তারপর বাজার করা হবে। বিয়েটাও একটু দেরীতে হবে, তাতে মাথাও ঠাণ্ডা থাকবে এবং পরবর্তী কাজও খুব সুষ্ঠুভাবে হবে।

– ও, তুই তাহলে তোর বিয়েটা তাড়াতাড়ি হোক তা চাস না?

– চাবো না কেন আমি চাইলেই কি হবে। বিধাতা যে সব ঠিক করে রেখেছে, আমি ঠিক করার কে? জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে। তুমি তো সবই জানো।

– আচ্ছা ঠিক আছে, আমার বিয়ের কার্ড আমিই দেবো ছোট জামাইকে।

– এই তো আমার লক্ষী মেজদি। দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরলো।

– মাকে বলবো তোর বিয়ের কথা?

– বলবি কিরে মা কি জানে না আমার ও হিরোর কথা?

– জানবে না আবার তোমরা যেভাবে কাণ্ড করে বেড়াচ্ছো। এ ঘটনা কে না দেখেছে? সুতরাং মাকে বলে এমন রসময় কাণ্ডের অবসান ঘটানোই ভালো। বিয়েটা হয়ে গেলেই হবে।

দুইবোনে বসে বসে চা পান করছে আর তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করছে। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তাদের নতুন পরিকল্পনা করার ছক আঁকছে।

– আমার মনে খুব দুঃখ হচ্ছে মেজদি আমি এ বাড়িতে তোকে ছাড়া মোটেই থাকিনি বলতো আমার দিন কেমন করে কাটবে।

– তোর হিরোকে নিয়ে দিন ঠিকই কাটবে। আমি ভাবি মায়ের কথা মায়ের দিন কি করে কাটবে। ভাগ্যিস সংসারে বিমলের বউ ও দুটো ছেলে আছে। ওদের নিয়ে মার সময় কাটবে। তবুও আমাদের জন্য মায়ের খুব পুড়াবে। লোকেরা যতই বলুক মায়েরা ছেলেদের আর বাবারা মেয়েদের বেশি ভালোবাসে। এটা সঠিক নয়, মায়েরা অন্তরাত্মা দিয়ে মেয়েদের গভীরভাবে ভালোবাসে আমি আমার মায়ের মধ্যে সেটা দেখেছি।

– ঠিক বলেছিস দিদি। রঞ্জনের মৃত্যুর পর আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি সেটা, লোকেরাও বারবার বলেছে। তোমরা বেশি কান্নাকাটি করলে মায়ের দুঃখ আরও বাড়বে। তাইতো আমরাও ভাইটার জন্য কাঁদতে পারিনি। মনে হয় বুকের ভিতর কত যন্ত্রণা, কত দুঃখ এখনও আটকে আছে। ইচ্ছা হয় গভীর বনে গিয়ে গলা ছেড়ে চিৎকার করে কাঁদি যাতে কেউ শুনতে না পায়। চোখের জল অঝোর ধারায় ঝরে যেন দুঃখটা খানিকটা লাঘব হয়।

– না-রে বোন এ দুঃখ একদিন আস্তে আস্তে কমবে।

– আমাদের কমবে কিন্তু মায়ের সহজে কমবে না, দেখিস না মা এখনও লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে।

– কাঁদবে না, তার নাড়ী ছেঁড়া ধন এমন করে কি ভোলা যায়। আমরা বাড়িতে না থাকলে মা আরও দুঃখ পাবে।

– আমরাতো মাঝে মাঝেই আসবো।

– কত আসবে তা জানা আছে, কই বড়দি আসে অনুষ্ঠান ছাড়া?

– আমি তো আসবোই, তোর বরের মত তো আমার বর ম্যাজিস্ট্রেট হবে না, আজ ঢাকা, কাল রাজশাহী, পরশু চট্টগ্রাম এই ভাবে বদলী হলে সে কি মাকে দেখতে আসতে পারে? আমি ঢাকা থাকবো, ইচেছ হলেই মায়ের কাছে আসবো।

মেজদির বিয়ে আগামী মাঘমাসে। মাত্র ২০ দিন বাকী আছে। নিকটতম আত্মীয়-স্বজন চারজন এসেছে। যাদের ছাড়া অনুষ্ঠান সম্ভব নয় তারা এসেছে। বিয়ের কাজ তো আর কম নয়। মেজদি ও আমার উপর ভার পড়েছে বিয়ের কাপড়-চোপড় কেনার। যাবতীয় কাপড় আমাদের পছন্দে হবে। ঠিক হয়েছে বিয়ের জোড়, কাতান, বেনারসী ও কনের অন্যান্য সৌখিন কাপড় ঢাকা থেকে কেনা হবে। প্রণামী ও সাধারণ কাপড় টাঙ্গাইল থেকে কেনা হবে। মেজদি আগেই আমার হিরোকে ফোনে খবর দিয়ে দিয়েছে। আমরা আসছি, তুমি ছুটি নিয়ে রেডি হয়ে থেকো। আমরা এখান থেকে গাড়ি নিয়ে যাবো, তোমার মেডিকেল কলেজের সামনে দাঁড়াবো তুমি ওখানে আসবে। আমরা তোমাকে তুলে নিয়ে যাবো।

দু'বোন ও ছোট জামাই প্রথমে শাখার দোকানে গেলাম। মা বলে দিয়েছে প্রথম শাখা ও সিঁদুর কিনবে। দামদর করবে না। মা আগেই টাঙ্গাইল থেকে হলুদ কিনে রেখেছে। শাড়ি ও অন্যান্য কাপড় পছন্দ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। আমরা গেলাম সব কিছু গাড়িতে তুলে হোটেলে খেতে গেলো। খেয়ে ফিরে আসার সময় হিরোকে সঙ্গে আসতে বললাম, হিরো তাতে আপত্তি জানালো। আমি বললাম,

– এখন গিয়ে কি করবে দুদিন পরেই তো বিয়ে তখন যাবে। মেজদি বলল, এখন গেলে দোষ কি?

হিরো বলল, দোষ নেই, আসলে আমার সময়ও খুব কম, তাই ভেবে রেখেছি বিয়েতে তো যেতেই হবে।

বিয়ের কার্ড ছোট জামাইকে দিতে আমার হাতে দিয়ে বলল, এ কার্ডখানা ছোট জামাইকে দিস। আমি কার্ডখানা হাতে নিলাম ঠিকই কিন্তু বললাম, আমি কেন দিবো। যাদের জামাই তারাই দিক।

– ঠিক বলেছিস, আমার বিয়ের কার্ড আমিই দিবো। তুই ঠিকই বলেছিস, জামাইও খুশি হবে।

হিরো তো সত্যি সত্যিই মেজদির বিয়ের দিন রাতে রাধাদের বাড়ি এসে উপস্থিত হলো। ওকে দেখেই মেজদি বলল, ওমা তোমার ছোট জামাই এসেছে। ওকে....বলার সঙ্গে সঙ্গে বান্ধবী সুরঞ্জনা মেজদির মুখ চেপে ধরে বলল, আস্তে বল, মা কালা নয়, তা ছাড়া তুই না কনেবৌ এতো চিল্লাচিল্লি করে কথা বলা ঠিক হচ্ছে? বান্ধবীটি মেজদির সামনে নিয়ে গিয়ে বলল, এ ব্যক্তি হলো এ বাড়ির ছোট জামাই, হিরো হাত বের করে নমস্কার দিল তারপর করমর্দনও করলো। মেজদির বান্ধবী হিরোর দুটি হাত ধরে মায়ের ঘরে নিয়ে গেলো। সব অতিথিদের ভোজনশালা বাইরে প্যান্ডেল করে সাজানো হয়েছিল, কিন্তু আমার হিরোর ঠাঁই হলো মায়ের নিজস্ব কক্ষে। মা পরিপাটি করে কারুকার্য আসন পেতে বসতে দিলো। ছোট জামাই ওখানে আমাকে দেখে কিছু বলতে যাচ্ছিলো। মা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তুই এখানে কেন? মেজ জামাইয়ের কাছে যা। মায়ের কথা শুনেই চলে যেতে পারলাম না। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম মা যেন ঠিক জামাইয়ের মত করেই তাকে খাওয়াচ্ছিল, আমার মনে হচ্ছিলো যেন সত্যিকারের জামাই হয়ে গেছে। হাত ধোয়ার পর মা যখন তোয়ালে দিয়ে হিরোর মুখ মুছে দিচ্ছিলো আমার হিরোর চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। মা ওর মুখ দু'হাত দিয়ে তুলে চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে সেও কেঁদে ফেললো। মা হিরোকে ধরে তার খাটে বসিয়ে দিলো। আমার হিরো এত স্নেহ পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলো সেদিন। মাকে প্রণাম করে হিরো ঘর থেকে বের হয়েই দেখলো আমি তার জন্য গভীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছি। শাড়ির আঁচল দিয়ে আমি তার চোখের জল মোছাতে গেলাম সে বলল, মুছতে হবে না। এ আনন্দ এতে মায়ের স্নেহের পরশ আছে। ওর চোখের জল দেখে আমারও চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগলো। ওর হাত ধরে ওকে নিয়ে বাইরে এলাম, আমার হিরো আমাকে একটা ফ্লাইং কিস দিয়ে বললো, তুমি বাসর ঘরে যাও। আসতে একটু দেরী হলো। খানিক পরে বাসরঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সবাই হৈ চৈ করে উঠলো। একলা এলে কেন? সাথের সঙ্গীটিকে কোথায় লুকিয়ে রেখে এলে। আমি মুখ লুকিয়ে মেজদির পাশে এসে বসলাম।

বিয়ে বাড়ি। বাড়ি ভর্তি আত্মীয়-স্বজন। সবাইকে রাতে শোয়ার ব্যবস্থা করে মাকে কিছু খাওয়ায়ে মায়ের ঘরে মায়ের বুকের কাছে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। মা বলল, এলি কেন?

– কোথাও এতটুকু জায়গা নেই মা, দেখলাম তোমার বুকের কাছে আমার ঠাঁই রয়ে গেছে। তাই লোভ সামলাতে না পেরে এখানেই এলাম। সারাদিন সবারই খুব খাটাখাটি হয়েছে, সবাই খুব ক্লান্ত, আমি লজ্জায় হিরো সম্বন্ধে মাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। মাও ওর সম্বন্ধে কিছু বলেনি। মাকে একদিন মেজদি বলেছিলো, মাগো রাধার কি হবে? তুমি কি সেটা সহ্য করতে পারবে? মা খুবই নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিয়েছিলো, কেন সহ্য করতে পারবো না। জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে। ভগবান সবই ঠিক করে রাখেন। ভগবান হয়তো রহমানকেই ওর জুটি করে পাঠিয়েছে। আমি বাধা দিলেও কিছু হবে না। ভগবানের ইচ্ছামতই সব হবে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ি, বিয়ে বাড়ির কোলাহলে সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি মায়ের মনটা খুবই খারাপ। বাসর ঘরে গিয়ে দেখি ওদের শয্যা তোলা হয়েছে, ওদেরকে সূর্য প্রণাম করাতে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা ঘরে এসে খাবার খেয়ে ওদের বাড়ি ময়মনসিংহ যাবে। যাবার সব প্রস্তুতি চলছে। বরযাত্রীদের মধ্য থেকে একজন এসে বলল, বৌভাতে কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে। আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। মেজদি বলে উঠলো, ভালো লাগলেও কিছু করার নেই কারণ সে বাধা পড়ে আছে শক্ত হাতের কব্জিতে। আমিতো লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম।

– ছেলেটি বলল, এ বয়সে একটু আধটু এমন বাধা পড়েই থাকে কিন্তু বিয়ে হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে, তাই না রে সুকান্ত।

রাধার বান্ধবী বলল, সর্বক্ষেত্রে এক ফল হয় না।

– নাই হলো। তবু আপনি যাবেন, আমরা তাতেই খুশি হবো।

– আচ্ছা আমরা যেতে চেষ্টা করবো।

মেজদি শ্বশুর বাড়ি চলে যাওয়ার পর আমি এমন এক সঙ্গী হারালাম যার অবর্তমানে আমার দিনই কাটতে চায় না।

এর মধ্যে হিরো এসে আমার এমন বিরহদশা দেখে আমার জন্য এতো বেশি ব্যথা পেলো যে আমিও বুঝতে পারিনি। আমাকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলল, এভাবে থাকলে তো তুমি মরেই যাবে, চল দুদিনের ছুটি নিয়ে ঢাকা থেকে বেরিয়ে আসবে। আমি কাকে সান্ত্বনা দিবো, নিজেকেই বুঝাতে পারছি না, তাই চুপ করে রইলাম।

হিরো আমার গলাটা ধরে বললো, তুমি শুনবে না আমার কথা ওঠ বাড়ি গিয়ে রেডি হয়ে এসো।

– না না আমি যেতে পারবো না, মাকে কে দেখবে?

– এতো সুদূর প্রসারী চিন্তা, তাহলে তো তোমাকে আমি পাবোই না।

– আমার রাধা, স্বাভাবিক নিয়মে ফিরে এসো। তোমার হিরোকে শান্ত করো।

– সবাই ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।

বাড়ি এসে দেখি মা তখনও খায়নি, আমার জন্য বসে আছে, ভাবলাম কেন আমি বাইরে বের হলাম।

– মা তুমি এখনও খাওনি।

– আজ শুক্রবার, ভাবলাম একসঙ্গে খাবো।

– রাখো, আমিতো মস্ত ভুল করেছি, আমি তো খেয়ে এসেছি।

– কোথায় খেলি তুই?

– কি আর করবো, বান্ধবী ছাড়লো না তাই খেয়ে এলাম।

– বেশ করেছিস মা, বেলা তো আর কম হয়নি।

– মাগো তুমি এখন খেতে বসো, আমি কাপড় ছেড়ে আসছি। আমি ঘরে গিয়ে জামা কাপড় একটা ব্যাগে নিলাম। আর একটা ভালো শাড়ি পরলাম, এসে দেখি মায়ের খাওয়া শেষ। মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, আমি একটু কাজে ঢাকা যাচ্ছি, দুদিন পরেই ফিরে আসছি।

– আচ্ছা সাবধানে যাবে।

তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে খুশি করতে আমি মাকেও মিথ্যে বলেছি। কোন অবস্থাতেই আমি আমার হিরোকে কষ্ট দিতে চাই নি। নিজের যত কষ্টই হোক, নিজে যত কষ্টই পাই না কেন তবুও আমার হিরোর গায়ে যেন আঁচড় না লাগে।

একদিন আমার হিরো বললো, চল আজ তোমাকে আমি অফিসার্স ক্লাবে নিয়ে যাবো।

– আমি কি ওখানে গিয়ে নিজকে এডজাস্ট করে নিতে পারবো?

– পারবে না মানে? তুমি আমার রাধা। রাধা পারবে না এমন কাজই নেই।

সত্যি সত্যিই আমাকে নিয়ে ক্লাবে গেলো, এই আমার জীবনে প্রথম ক্লাবে যাওয়া। ঢুকেই দেখি নানা গ্রুপ, নানা রকমের গান, নাচ, ড্রিংকস করা জড়িয়ে ধরে নাচ করা। দেখে যেন আমি কেমন হয়ে গেলাম। আমার এহেন অবস্থা দেখে হিরো তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে নাচতে শুরু করলো। আমিও শঙ্কিত মনে ওর হাত ধরে কোন রকমে নাচতে লাগলাম, আমি কি কোনদিন আগে নেচেছি। আমার হিরো যতটুকু আমাকে শিখিয়েছিল ততটুকুন দিয়ে নেচে গেলাম। এর মধ্যে বেয়ার সার্ফ করা হলো। হিরো চালাকি করে সেটাও পান করে নিলো। হিরোর বন্ধু মাহতাব বললো, আমরা তো জানি না ম্যাডাম এত স্মার্ট আবার নিয়ে এসো।

বাড়ি এসে আমি হিরোকে বললাম, আর কোনোদিনও আমায় এমন স্থানে নিয়ে যাবে না। আমি এডজাস্ট করতে পারি না। আমার ভীষণ কষ্ট হয়।

– তুমি কষ্ট পাও তা কি আমি চাই। কোনোদিন যদি এমন অবস্থায় পড়ে লজ্জা না পাও তার জন্য একটু আধটু পরিস্থিতি জেনে রাখা ভালো। তাহলে তোমাকে অপ্রস্তুত হতে হবে না এবং আমিও সবার সামনে বোকা হবো না। তাইতো তোমাকে আমার বন্ধুমহলে পরিচিত করে দেই। তুমিতো আমার মুখ উজ্জ্বল করতেই চাও।

– নির্দ্বিধায় আমি তোমার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি চাই।

মেজদির বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে চলে যাওয়ার পর আমি যেন কেমন একাকীত্বে ভুগছিলাম। মেজদির বিয়েতে বড়দি যখন টাঙ্গাইল এসেছিল তখন মেজদি আমার ও আমার হিরো সম্বন্ধে বিস্তারিত খুলে বলেছিল। এ বিয়েতে মায়ের যে কোন অমত ছিলো না তাও জানিয়েছিল। সবার যেখানে মত আছে সেখানে অমত করার কোন কারণ ছিলো না এবং বড়দিও এ ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য করেনি। উপরন্তু মাকে মত দিয়ে দিয়েছে, তুমি অভিভাবক তাই তুমি সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে তোমার ছোট মেয়ের বিয়ে দাও। মাও সেই মতে মেয়ে ও ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করে রাখলেন এবং একদিন ভালো দিন দেখে হিরোর বাড়িতে সংবাদ দিয়ে

বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করবে। মনে মনে ও ভিতরে ভিতরে বিয়ের সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এর মাঝে মেজদি তার বরকে নিয়ে দ্বিরাগমনে এসেছিল, তখন মাকে রাধার বিয়ে তাড়াতাড়ি দেওয়ার কথা বলে গেছে। মা তো সবই জানে এবং বুঝতেও পেরেছে। তাছাড়া অন্নপূর্ণার বিয়ের পর অনুরাধা মানসিক দিক থেকে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। মা প্রায়ই লক্ষ্য করে রাধা কলেজ থেকে এসেই যেন কেমন অন্যমনস্ক থাকে। অধিকাংশ সময় শুয়েই থাকে বেশি কথাবার্তা বলে না। ওদিকে হিরো ছেলেটা নিজের কাজে বর্তমানে এতো ব্যস্ত যে টাঙ্গাইল খুব কম আসে। তাতে মেয়েটা আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। হিরোতো নিজের নাম যশের জন্য যারপরনাই পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আজ দেশে, কাল বিদেশে নানা বিষয়ে ট্রেনিং, সিম্পোজিয়াম নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত আছে। মেয়ে তো নিজেও চায় তার হিরোর নাম হোক, তাতেই তো হিরো খুশি। আর হিরো খুশি হলেই রাধাও খুশি, মা তার মেয়েকে খুশি করার জন্য বিয়েটা তাড়াতাড়ি দিতে চাচ্ছে। একদিন শুভ দিন দেখে অনুরাধার মা অনুরাধার বিয়ে ঠিক করার জন্য হিরোর বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে উনাদের আসতে বললেন। পাত্রপক্ষ তাদের পুত্রের বিয়ে ঠিক করার জন্য নিতান্তই আপন কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে পাত্রপক্ষকে পাত্রের বাবা আলহাজ মো. মতিউর রহমান নির্দিষ্ট দিনে অনুরাধার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো। সেখানে পাত্র পক্ষকে যথেষ্ট সম্মান জানিয়ে মো. আতোয়ার ও অনুরাধার শুভ বিবাহ দেওয়ার দুই পক্ষ চুক্তিবদ্ধ হলো। আগামী ১৫ই বৈশাখ তাদের শুভ বিবাহ কন্যার বাড়িতে সুসম্পন্ন হবে। উভয় পক্ষই বিয়েতে রাজি, হিরোর পিতা জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোন মতে কন্যার বিয়ে দিবেন। কন্যার মা উত্তর দিলো, আমি আমার মতেই কন্যার বিয়ে দিবো। বিয়ের পর যখন কন্যা আপনার ঘরে উঠবে তখন কন্যার ইচ্ছে ও আপনার মতে আপনাদের ঘরনী করে নিবেন। কথাটা শুনে হিরোর বাবা খুব খুশি হলো এবং সেই খুশির আমেজ নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে মহা আনন্দে বাড়ি পৌঁছান।

কনে বাড়িতে এসে খাওয়া-দাওয়া, আচার-ব্যবহার সব কিছুতেই মো. মতিউর রহমান সন্তুষ্ট হয়েছেন। শুধু নিয়ম কানুনে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখতে পেরেছে। কিন্তু তা দেখলে কি হবে, মিলেছে মোগলের সাথে খানা খেতে হবে একসাথে। আত্মীয়তা করলে একটু আধটু অনিয়ম মেনে নিতেই হবে। মতিউর রহমান ঠিকই বুঝতে পেরেছে তাদের কিছু করার নেই সব মেনে নিতেই হবে।

এদিকে হিরোর কাজ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। গত সপ্তাহে ইউরোপ কান্ট্রিতে তার ট্রেনিং চলছিল এবং তাদের হিরো এত ভালো উত্তর করতে পেরে এতই সন্তুষ্ট হয়েছে যে মনে হচ্ছিল ওখান থেকেই তার রাধাকে সে তুলে নিয়ে এসে আদরে আদরে ভরিয়ে তোলে। ফোনে বলেছিল তোমার অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসায় এবং আশীর্বাদে ঈশ্বর আমার দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। আমি সবাইকে আমার অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জানাই। এক সপ্তাহ পরেই প্রিয়তমা আমি তোমার কাছে আসছি, কৃতজ্ঞতা জানাতে। এখন টেলিফোন পেয়ে বাংলাদেশ থেকে রাধা আনন্দে আপ্লুত হয়ে ঈশ্বরের কাছে বারবার প্রার্থনা করছে, আমার হিরোর যেন মনোবাসনা পূর্ণ হয়, তাহলে ঈশ্বর আমিও তোমার পূজো দিবো, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবো। আমার স্বামীর মঙ্গলের জন্য তার পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য আমি ঈশ্বরের দরবারে সর্বমঙ্গলার পূর্ণ থলি নিয়ে তোমার সামনে দাঁড়াবো, তুমি তো আমাকে ফিরাতে পারবে না, গ্রহণ করবেই।

আমি আমার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কাগমারী কালিপুর বাবা লোকনাথ আশ্রমে পূজার পূর্ণপাত্র নিয়ে মনভরে পুজো দিয়ে এসে পূর্ণপাত্র হাতে নিয়ে শান্তিকুঞ্জ মোড়ে সাত রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াবো, তখন দেখবো, আমার প্রিয়তম দিগ্বিজয়ী রাজা মাথায় মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে বরণ করার অপেক্ষায়, ওহে প্রিয়তম এসো এসো হে, আমি বরণডালা হাতে দাঁড়িয়ে আছি, এসো।

আমার প্রিয় তার কাঙ্ক্ষিত প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠত্বে আহরণের জন্য আজই সে নিউইয়র্কে যাত্রা করছে। আমরা যারা তার হিতাকাঙ্ক্ষী তারা চাতক পাখির ন্যায় অপেক্ষমাণ বাংলায় সচিত্র পর্দার সামনে। পর্দায় তাকিয়ে থেকে যৎকিঞ্চিত দেখতে পাচ্ছি তাতেই আমরা খুবই উৎসাহিত ও আনন্দিত।

আমার হিরোর মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। সেই মহানন্দে আমরাও খুবই আনন্দ অনুভব করছি। এখন শুধু অভ্যর্থনা করার পালা। অভ্যর্থনার পরই বিয়ের প্রস্তুতি। সমস্ত প্রস্তুতি পূর্ব থেকেই নেওয়া হয়েছে। এখন শুধু

কাজ শেষ করতে হবে সবাইকে এক সঙ্গে নিয়ে। বিয়ের সমস্ত সরঞ্জাম ঢাকায় এনেছে। তোমার ইচ্ছেমত ঢাকাতে তোমার নতুন বাড়িতে বিয়ে হবে। এখন সর্বশেষ কাজটি করার অপেক্ষায়।

তুমি বলেছিলে না, তোমাকে বরণ করে যেন ঢাকা এয়ারপোর্টে থেকে তোমার তৈরি বাড়ি যেখানে আমরা থাকবো সেখানে নিয়ে আসতে, তুমি ঠিক করে রেখেছিলে কোন শাড়িটা আমি পরবো, কপালে বড় করে সিঁদুরের টিপ পরতে বলেছিলে, আরও বলেছিলে বিয়ের দিন তুমি সিঁথিতে গাঢ় করে সিঁদুর পরাবে। ওগো আমি তো তোমার কথা সব শুনেছি, তোমার কথা একটাও এদিক ওদিক হয়নি। আমি, মেজদি, ইকবাল ও তোমার ঘনিষ্ঠ দু'বন্ধু মিলে তোমাকে এখানে বরণ করবো বলে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম তুমি আমার হাত দুটি ধরে বললে, রাধা প্রিয়ে এটা কি হচ্ছে? তোমাকে এতো কাছে পেয়ে চোখ মুছে আমার মুখখানা তোমার কানের কাছে নিয়ে বললাম, মজা করছি। আমার হিরো বললো, বেশ তো এসো আমরা দুজনে এক সঙ্গে ঢুকি, হাত বাড়ালাম আর হাত ধরা হলো না, কেমন যেন লাগলো, দুর্বল লাগলো, আমার কথা বলতে ইচ্ছে করলো না, ভাবলাম হিরো কি ভাববে। চোখ বুঁজে আসছে, চোখ মেলাতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। আমি যেন কেমন করে ঠাস করে পড়ে গেলাম। সবাই ধরাধরি করে তুলল, আমি যেন কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। সকালবেলা ঘুম ভাঙলে বিছানা হাতিয়ে দেখি আমার হিরো বিছানায় নেই। মেজদি আমার মুখের কাছে বসে আছে, মনে হলো সারারাত ঘুমায়নি। কিরে দিদি রাতে ঘুমোসনি।

– না তুইও তো ঘুমোসনি।

– ঘুমুবো কিরে, আমার হিরো কই?

– হিরো আসবে, একটু দেরি হবে।

– তাহলে আমার বিয়ে হবে না? আমি অনূঢ়া থাকবো। কি বলিস?

না- মা সেটা হবে না। আমার হিরো আমাকে কথা দিয়ে গেছে। আর বলেছে, বিয়ে করে ওরা গুলিস্তানের নয়া বাড়িতে উঠবে। 'তোদের কথা মানবো না' বলেই ওদের নানা ঢঙে নানা রকমের ছবি ও অন্যান্য জিনিস ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে আর বলতে লাগলো, আমার বাড়ি চাই না, ছবি চাই না, বিত্ত যশ প্রতিপত্তি কিছুই চাই না, আমি চাই হিরোকে শুধু আমার হিরোকে।

তোমরা কি বললে, প্লেন বিধ্বস্ত! ওমা...।

আমার এ অবস্থা দেখে ঘরের সবাই হু হু করে কেঁদে উঠলো। আমি খাট থেকে নেমে বললাম, এই তোমরা সবাই কাঁদছো কেন? বলো না আমাকে? সব ঠিক আছে তোমরা না বললে আমার হিরো আমার কাছে কিছু লুকোতে পারবে না। সে এসে আমাকে সব বলে দিবে। আমার এমন লাগছে কেন? আবার আমার মাথাটা যেন কেমন করছে। ওরা এসে আমাকে ধরে খাটে শুইয়ে দিলো।

কতক্ষণ শুয়ে ছিলাম জানি না। ঘুম থেকে উঠে মনে হয়, আমার হিরো, আমার অস্তিত্ব কই? তুমি কেন আমাকে এতো ভালোবাসলে? আমি যদি সাগরে তলিয়ে যেতাম সেখান থেকেও তুমি তোমার প্রবল প্রেমের জোরে তোমার রাধাকে খুঁজে আনতে। তবে আজ কেন এমন করছো? কেন তোমার রাধার হৃদয়াকাশে স্থান খুঁজে পাচ্ছো না। তোমার রাধা যে তোমার জন্য উন্মত্ত। আবার চিৎকার করতে করতে জ্ঞান হারালো।

না মিটিতে সাধ মোর নিশি পোহায়
গভীর আঁধার ছেয়ে আজো হিয়ায়।